মাওলানা সাদ সাহেব সম্পর্কে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারতের ২০২৩ সালের ফতোয়া

জুন ২০২৩ ই. / যিলকদ ১৪৪৪ হি.
মাওলানা সাদ সাহেব সম্পর্কিত একটি ইস্তিফতার উত্তরে
দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারতের ফতোয়া বিভাগ থেকে
প্রকাশিত ফতোয়া

মাওলানা সাদ সাহেব সম্পর্কে
দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারতের
২০২৩ সালের ফতোয়া

মাওলানা সাদ সাহেব সম্পর্কে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারতের ২০২৩ সালের ফতোয়া

জুন ২০২৩ ই. / যিলকদ ১৪৪৪ হি.
মাওলানা সাদ সাহেব সম্পর্কিত একটি ইস্তিফতার উত্তরে
দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারতের ফতোয়া বিভাগ থেকে
প্রকাশিত ফতোয়া

অনুবাদ
আবদুল্লাহ আল ফারুক

মাকতাবাতুল আসআদ
ঢাকা

মাওলানা সাদ সাহেব সম্পর্কে
দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারতের
২০২৩ সালের ফতোয়া

আবদুল্লাহ আল ফারুক অনূদিত

প্রকাশকাল : যিলহজ ১৪৪৪ হি. । জুলাই ২০২৩ ঈ. ।

স্বত্ব : সর্বসাধারণের জন্যে উম্মুক্ত

মূল্য : সবার কাছে দুআর বিনম্র অনুরোধ

প্রশ্ন নং : ১১৩৬০/বা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

শ্রদ্ধেয় হযরত মাওলানা মুফতি আবুল কাসিম নুমানি দামাত বারাকাতুহুম ও দারুল উলূম দেওবন্দের সকল সম্মানিত মুফতি,

আস সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

আপনাদের সকাশে নিবেদন হলো– তাবলীগ জামাতের একজন পরিচিত ও উঁচু পদের যিম্মাদারের পক্ষ থেকে অজ্ঞতাপূর্ণ কথা দিনদিন বেড়েই চলেছে। আমরা রমাযানের পূর্বে ভূপাল ইজতিমা ২০২২ ই. আলেমদের মজলিসের বয়ান আপনাদেরকে জানিয়েছিলাম। যা পড়ে আপনারা মৌখিকভাবে আফসোস ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো লিখিত উত্তর পাইনি। সম্প্রতি এপ্রিল ২০২৩ ই. এর নতুন বয়ান সামনে এসেছে। সেই বয়ানে তিনি উলামায়ে কেরাম ও মাদরাসার পরিচালকদেরকে দ্বিধায় ফেলে দিয়েছেন। আমরা হতভম্ব যে, একজন লোক গোটা দুনিয়ার সকল আলিম ও বুজুর্গদেরকে ধিক্কার দিয়ে বলছেন যে, ব্যবসা করাটা আলিমদের জন্যে জনসাধারণ অপেক্ষা অধিক জরুরি। দ্বীনের খাদিমদের দায়িত্ব হলো, নিজের ভরণ-পোষণের বন্দোবস্ত নিজেই করা। এর অন্যথা হলে দ্বীনের জন্যে তাদের সকল চেষ্টা-সাধনা ত্রুটিপূর্ণ। জনগণ ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করবে, এটি ভুল ধারণা। তিনি পরিষ্কার শব্দে এ কথা বলেছেন,

> “রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে এবং তাঁর খুলাফায়ে রাশেদিনকে এভাবে অভ্যস্ত করেছিলেন যে, তোমাদের কাছে কোনো সম্পদ এলে প্রত্যাখ্যান করবে। তোমাদের দ্বীনি খিদমতের কারণে তোমাদের কাছে কোনো সম্পদ পেশ করা হলে তা গ্রহণ করবে না। সাহাবায়ে কেরাম জানতেন না যে, পারিশ্রমিক ও সাওয়াব কীভাবে একত্র হতে পারে! অথচ এ যুগের লোকেরা বলে যে, সাওয়াবও পাবে, আবার পারিশ্রমিকও পাবে।

অথচ সাহাবায়ে কেরাম জানতেন না যে, দ্বীনের কোনো খিদমতের জন্যে পারিশ্রমিক নিলে আমাদের সাওয়াব বাকি থাকবে। সাহাবায়ে কেরাম তা জানতেন না। পরবর্তী যুগের লোকেরা তাবিল (অপব্যাখ্যা) করে নিজেরা অভাবমুক্ত হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনের খিদমতের জন্যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার অভ্যাস বানিয়ে ফেলেছে। অভাবমুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এ কাজ করছে। অথচ সাহাবায়ে কেরাম অভাবী হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনি খিদমতের ওপর বিনিময় গ্রহণ করতেন না। অথচ এ যুগের লোকেরা এটাকে অভ্যাস বানিয়ে ফেলেছে।

আমি মনে করি, একজন শিক্ষক মাদরাসায় পড়ানোর পাশাপাশি ব্যবসা করবেন। যারা মাদরাসায় পড়ান না, তাদের ব্যবসা করার তুলনায় মাদরাসা শিক্ষকদের ব্যবসা করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি। প্রত্যেক শিক্ষক, মুহাদ্দিস, আমির ও মুবাল্লিগ নিজেদের দ্বীনি খিদমতের পাশাপাশি ব্যবসা করবেন। যেসব সাধারণ অজ্ঞ মানুষ কোনো সম্মিলিত কাজের দায়িত্ব পালন করছেন না, তাদের ব্যবসা করার তুলনায় আলিমদের ব্যবসা করা অধিক জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ জনগণের জন্যে ব্যবসা করাটা ততটা জরুরি নয়।

বুজুর্গানে দ্বীন, উলামা ও মুবাল্লিগগণ দুনিয়াবি কাজে লিপ্ত হলে দ্বীনের মাঝে ব্যঘাত সৃষ্টি হবে– জানি না, কোত্থেকে এই মানসিকতা গড়ে উঠেছে! কোত্থেকে এই বিষয় সৃষ্টি হয়েছে! অথচ আমি মনে করি, এর ফলে তাদের মেহনতের সহায়ক হবে। আজ তারা কিতাব থেকে ব্যবসা সংক্রান্ত অধ্যায় পড়াচ্ছেন। অথচ তার থেকে উত্তম হলো, তারা নিজেরাই বাজারে বসে উম্মতকে প্র্যাক্টিক্যাল ব্যবসা শেখাবেন। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, এ যুগে কাফেরদের মতো মুসলমানরাও আলিম ও বুজুর্গদের ব্যবসা করাকে দুষণীয় মনে করে। যেভাবে কাফেররা নবিদের কোনো পার্থিব কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়াকে অপরাধ মনে করতো, এ যুগের মুসলমানরাও তদ্রূপ আলিম ও বুজুর্গদেরকে কোনো বাণিজ্যিক বা কোনো পার্থিব কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়াকে দোষ মনে করে।

আমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছি। একজন মাদরাসা শিক্ষকের ব্যবসা করা একজন নন-আলিম ব্যক্তির ব্যবসা করা থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি। কারণ দুটি। যেন তারা সৃষ্টিজীব থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে দ্বীনের খিদমত করতে পারেন। দ্বিতীয় যে কারণটি বলছি, তা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তা হলো আবু বকর রাদি. এর আমল। (তিনি বলেছিলেন,) ‘খিলাফতের দায়িত্ব আমাকে ব্যবসা থেকে বাঁধা দিতে পারবে না।’ আপনি ভেবে দেখুন। সকল মুসলমানের সমস্ত যিম্মাদারি তাঁর ওপর। যত দূর ইসলাম ছড়িয়েছে, সেখানকার সকল মুসলমানের তিনি আমির। তাহলে তার যিম্মাদারিতে কত বেশি কাজ হতে পারে! এত বেশি ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি ব্যবসা করাকে খিলাফতের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক মনে করছেন না। এটাকে দোষ মনে করছেন না। হযরত উমর রাদি. আপত্তি তুলে বলেছিলেন যে, আপনার ব্যবসা খিলাফতের দায়িত্ব পালনে বিঘ্ন হবে। তিনি উত্তরে বলেন, ‘কীভাবে বিঘ্ন হবে? আমি এই দায়িত্বও পালন করব, ব্যবসাও করব।’

আলিমদের ব্যবসা করার আরেক কারণ হলো, তারা যেন বাজারঘাটে যান, আইন-আদালতে যান। ব্যাংকিংসহ পৃথিবীর সকল শাখায় প্রবেশ করেন, যেন পার্থিব সকল শাখায় মুসলমানগণ তাদের সাথে প্র্যাক্টিক্যাল যোগাযোগ করে। এখন যে স্রেফ কিতাবি সম্পর্ক আছে, আমি তাকে দ্বীনের জন্যে যথেষ্ট মনে করি না। কিতাবি শিক্ষা কখনই প্র্যাক্টিক্যাল শিক্ষা নয়। আপনারা ননপ্র্যাক্টিক্যাল শিক্ষাকেই একমাত্র শিক্ষা মনে করে বসে আছেন। কথাগুলো বুঝতে পারছেন? কিতাবি শিক্ষার মতো ননপ্র্যাক্টিক্যাল শিক্ষাকেই একমাত্র শিক্ষা মনে করে বসে আছেন। শিক্ষাকে অব্যবহারিক করে রেখেছেন। হযরত উমর রাদি. এর শাসনামলে কারো জন্যে এই অনুমতি ছিল না যে, ব্যবসার বিষয়াদি ও তৎসংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের পরীক্ষা না দিয়ে কেউ মদিনাতে দোকান খুলবে। আমরা তো মুসলমানদেরকে নামায-রোযা শেখাতে চাই। আমরা তাদেরকে ইসলামি ব্যবসা দেখাতে চাই। মদিনায় এসে ব্যবসার ইসলামি পদ্ধতি দেখে যাও।

এজন্যে আমি নিবেদন করছি যে, ছাত্র বা শিক্ষক- প্রত্যেকের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব অন্য কেউ নেবে– এটা ভুল ভাবনা। আমি মনে করি, এর ফলে ছাত্র ও শিক্ষক, উভয়ের মুজাহাদা ক্রটিপূর্ণ হয়ে যায়। শিক্ষকের মুজাহাদাও ক্রটিপূর্ণ। ছাত্রের মুজাহাদাও ক্রটিপূর্ণ। তারা তো খুশি যে, সমাজের ধনী ব্যক্তিরা আমাদের সকল প্রয়োজন পূরণের যিম্মাদারি পালন করছেন। কাজেই আমাদের কিছু করার কী প্রয়োজন! শিক্ষাকও খুশি, ছাত্রও খুশি। শরিয়তের মূল উত্তম বিধান (আজিমত) যখন খতম হয়ে যায় তখন রুখসত (জায়েজ ছাড় বিধান)-ই প্রত্যেকের অভ্যাসে পরিণত হয়। এখন কেউ আজিমতের বয়ান দিলে মানুষ মনে করে, সে বুঝি রুখসতের বিধানকে অস্বীকার করছে। এজন্যে তারা বরদাশত করতে পারে না। তারা মনে করে, আমাদের খণ্ডন করা হচ্ছে। আসলে এটি আপনাদের খণ্ডন নয়; বরং মূল বিধানের দিকে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ জরুরি।

আমার বক্তব্য হলো, শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের পাশাপাশি নিজের সকল প্রয়োজন পূরণের নিজেই যিম্মাদার হওয়া সাহাবায়ে কেরামের, খুলাফায়ে রাশেদিনের, সকল নবি-রাসূলের বৈশিষ্ট্য। এটি শুধু জরুরতই নয়; সিফাত (বৈশিষ্ট্য)। জরুরত তো যেনতেনভাবে পূরণ হয়ে যাবে। আমি বলি, এটি হলো সিফাত যে, নবিগণ ব্যবসা করতেন। প্রত্যেক নবির কোনো না কোনো পেশা ছিল। কেউ লৌহকার ছিলেন। কেউ কাঠমিস্ত্রি ছিলেন। এ যুগের মুসলমানরা যেসব কাজকে দোষ মনে করে, নবিগণ সেসব কাজ করেছেন। অথচ সেগুলোকে এ যুগে দোষ মনে করা হয়। আপনারা আজ এমন স্থানে পৌঁছে গেছেন যে, শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি কোনো ভালো ব্যবসা করাকেও আপনারা দোষ মনে করছেন! (হায়াতুস সাহাবার তালিম, ২৯ এপ্রিল ২০২৩ ই.)

হে শীর্ষস্থানীয় উলামা হযরাত,

তার এই বয়ান মারাত্মক গুমরাহি সৃষ্টিকারী মনে হচ্ছে। এর মাধ্যমে বয়ানকারী ব্যক্তি জনগণকে পরিষ্কার এই অনুভূতি দিচ্ছেন যে, সমগ্র পৃথিবীতে তিনি একাই আজিমত (শরিয়তের মূল উত্তম বিধান) এর দিকে

আহবান করছেন। এজন্যে আলিমগণ তার বিরোধিতা করছেন। আপনারা নিন্দুকের নিন্দার ভয় এড়িয়ে পূর্বেও একটি বড় পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। একটি সর্বসম্মত ফতোয়া জারি করেছিলেন। পরবর্তীতে আরেকটি লেখায় লিখেছিলেন যে, তিনি একটি নতুন দল বানাচ্ছেন। কিন্তু দারুল উলুম দেওবন্দের শত্রু, কতিপয় অদূরদর্শী লোক দারুল উলূম দেওবন্দ ও আমাদের আকাবিরের ওপর বেহুদা অপবাদ আরোপের মিশন শুরু করে দিয়েছিল। পর্ব আকারে প্রবন্ধ লিখেছে। আমরা দেওবন্দের আকাবিরদের ওপর পূর্ণ আস্থা লালন করি যে, তারা হকের ব্যাপারে কখনই কারো দ্বারা প্রভাবিত হন না।

আমরা আপনাদের কাছে ইতোপূর্বে আরো অনেকগুলো বয়ান পেশ করেছি। যার কোনোটায় আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের শানে বেয়াদবি হয়েছে। কিছু বয়ানে এই দাবি তোলা হয়েছে যে, বর্তমান সময়ের শিক্ষাদান ও দ্বীনের দাওয়াতের পদ্ধতি সুন্নাতপরিপন্থী। সেগুলো নিরীক্ষণ করার পর আপনাদের কাছে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রত্যাশা করছি–

(১) বয়ানকারীর উক্ত বয়ানগুলো কি শরিয়তের আলোকে সঠিক? এমন ব্যক্তির বিভ্রান্তিকর কথা কি অন্যদের কাছে পৌঁছানো ও প্রচার করা জায়েয?

(২) যারা এমন ব্যক্তির পক্ষে কথা বলে এবং ভুল দলিল সরবরাহ করে, তাদের ব্যাপারে শরিয়ত কী বলে?

(৩) কিছু লোক জনগণকে বোঝাচ্ছে যে, দারুল উলূম দেওবন্দের লোকজন সবসময় তাবলীগের বিরোধী ছিল। দারুল উলূম দেওবন্দ কি বাস্তবেই তাবলীগের বিরোধী?

আমরা এই প্রশ্নগুলোর স্পষ্ট শব্দে উত্তর চাই। আমরা আপনাদেরকে এই তথ্য জানাতে চাই যে, দারুল উলুম দেওবন্দের দ্ব্যর্থহীন অবস্থান সামনে না আসার কারণে উলামায়ে কেরাম দ্বীনি পথপ্রদর্শনের ক্ষেত্রে নানাবিধ জটিলতার মুখোমুখি হচ্ছেন। অনেক ইমামের ইমামতি চলে যাচ্ছে। সব জায়গায় অস্পষ্ট ও পরস্পরবিরোধী কথাবার্তা ছড়িয়ে পড়ছে। কেউ বলছে, ‘তিনি রুজু করেছেন। এজন্যে আমরা নিরুপায়। অতএব, আবারও দারুল উলুম দেওবন্দের শরণাপন্ন হোন। এই মাদরাসাই আমাদের জন্যে হককে হক হিসেবে চেনা ও বাতিলকে বাতিল হিসেবে জানার সবচেয়ে বড় কেন্দ্র।’

এজন্যে আমরা পরিষ্কার শব্দে উল্লেখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর চাই। আমাদের অনুভূতি ভুল হলে যেন সেই ভুলগুলো চিহ্নিত করে দেওয়া হয়।

ওয়াস সালাম।

ফতোয়া জিজ্ঞেসকারী :

১. **আবদুর রশিদ**। উসতায, মাদরাসায়ে যিয়াউল উলুম, মধ্যপ্রদেশ
২. **মুহাম্মাদ খালেদ**। উসতায, মাদরাসা আরাবিয়্যা, এমপি
৩. **রফিক আহমদ**। উসতায, দারুল উলূম মুহাম্মাদিয়া, এমপি
৪. **মাওলানা মুফতি যিয়াউল্লাহ খান,** শাইখুল হাদিস, জামিয়া ইসলামিয়া, ভুপাল
৫. **যুবাইর আহমদ কাসেমি**, উসতায, দারুল উলুম বাংলাওয়ালি
৬. **জুনাইদ আহমদ কাসেমি,** উসতায, দারুল উলূম সাগার, এমপি
৭. **মুফতি ইনসাফ,** উসতায, আনওয়ারুল উলূম ভুপাল
৮. **মৌলভি যুবাইর,** উসতায, উক্ত মাদরাসা
৯. **মুহাম্মাদ ইরফান আলম কাসেমি,** উসতায, ইরফানুল হুদা, ভুপাল
১০. **মুহাম্মাদ আবরার**, উসতায, যিয়াউল উলুম, এমপি
১১. **মুহাম্মাদ মাহবুব কাসেমি,** মুফতি, রাহাতগড়, সাগার, এমপি
১২. **মুহাম্মাদ যুহাইর**, কাজি, মধ্যপ্রদেশ
১৩. **মুহাম্মাদ রিযওয়ান কাসেমি,**
উসতায, দারুল ইফতা, জামেয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া মসজিদে তরজমাওয়ালী, ভুপাল

দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত
দারুল ইফতা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

الجواب، وبالله التوفيق

দারুল উলুম দেওবন্দ সর্বশেষ লেখায় (৩১ জানুয়ারি ২০১৮ ই. তারিখে প্রচারিত) আলোচিত ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা ও মতাদর্শ সম্পর্কে লিখেছিল যে,

> দারুল উলূম দেওবন্দ নিজ অবস্থান ব্যক্ত করার সময় আলোচিত ব্যক্তির যেই মতাদর্শিক স্খলনের ওপর আফসোস প্রকাশ করেছিল, তা উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। কারণ, একাধিকবার তিনি রুজু করার পরেও নানা সময় তার থেকে এমন নিত্যনতুন বয়ান আমাদের কাছে পৌঁছেছে, যার মাঝে পূর্বের সেই মুজতাহিদসুলভ আন্দাজ, ত্রুটিপূর্ণ দলিল উপস্থাপন এবং দাওয়াত সম্পর্কে তার একান্ত নিজস্ব চিন্তাধারার ওপর শরিয়তের কথামালার ভুল প্রয়োগ প্রকাশ পেয়েছে। যার কারণে শুধুমাত্র দারুল উলূম দেওবন্দের উসতাযগণই নন; অন্যান্য হকপন্থী আলিমগণও তার সামগ্রিক চিন্তাধারার ওপর মারাত্মক আস্থাহীন। আমরা মনে করি, আমাদের আকাবির রহিমাহুল্লাহর চিন্তাধারা থেকে সামান্যতম বিচ্যুতিও মারাত্মক ক্ষতিকর। তাকে অবশ্যই নিজ বয়ানের ক্ষেত্রে সতর্ক হতে হবে। পূর্বসূরিদের পদ্ধতি অনুসরণ করে শরিয়তের কথামালা থেকে ব্যক্তিগত ইজতিহাদের এই কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে। কেননা তার এসব অদূরদর্শী ইজতিহাদ ও উদ্ভাবন দেখে মনে হচ্ছে –আল্লাহ না করুন– তিনি এমন একটি নতুন দল গঠন করতে উঠে-পড়ে লেগেছেন, যারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ, বিশেষ করে নিজ পূর্বসূরিদের মতাদর্শ থেকে ভিন্ন।’

এই লেখা প্রকাশ করার পর থেকে অদ্যাবধি দারুল উলূম দেওবন্দের উসতাযদের কাছে সময়ে-অসময়ে এমনসব বয়ান পৌঁছেছে, যা পড়ে

নির্দ্বিধায় এ কথা লেখা যায় যে, তিনি নিজেকে সংশোধন তো করেননি; উল্টো ভুল ইজতিহাদ, দ্বীন ও শরিয়তের বিকৃতি এবং মনগড়া দৃষ্টিভঙ্গির ওপর অবিচল থাকার প্রবণতার দিকে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন। ভুপালের আলেমদের পক্ষ থেকে নিকট অতীতের যেসব তাজা বয়ান আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে, (যার মাঝে ১৩ মে ২০২৩ ই. বাদ ফজরের বয়ানও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।) সেখানে দারুল উলুম দেওবন্দের উল্লেখিত বস্তুনিষ্ঠ অবস্থান সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, বিষয়টি ব্যক্তির কোনো আংশিক বিচ্যুত বয়ান নয়; বরং তিনি চৈন্তিক বক্রতা, ইলমের স্বল্পতা ও যোগ্যতাশূন্য হওয়া সত্ত্বেও ইজতিহাদ ও আবিষ্কার করার দুঃসাহস দেখিয়ে চলেছেন। যার ফলে তার মাধ্যমে দ্বীনবিকৃতির এটি স্বতন্ত্র ধারা চালু হয়েছে। এরচেয়েও অধিক বিপদজনক বিষয় হলো, তার অনুসারীরা সেই বিভ্রান্ত মতাদর্শের পক্ষে ভিত্তিহীন দলিল-প্রমাণ সোশ্যাল মিডিয়ায় দেদারছে প্রচার করে বেড়াচ্ছে। দারুল উলুম দেওবন্দ ও সেখানকার আসাতিযায়ে কেরামের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা দাবি ও অজ্ঞতাপ্রসূত কথাবার্তা জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার মিশন চালিয়ে যাচ্ছে। এতদিন আমরা এসব কার্যকলাপ উপেক্ষা করেছি। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, জমহূর তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য ও অজ্ঞতাপ্রসূত কথাবার্তা জনগণের মাঝে ব্যাপকাকারে ছড়ানো হচ্ছে; জনগণের সামনে আমাদের আকাবির রহিমাহুল্লাহর মতাদর্শের সুস্পষ্ট ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে; ‘সিরাতে সাহাবা’ শিরোনাম দিয়ে সোনালি যুগের ভুল ও মনগড়া চিত্র উম্মতের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে এবং সেসব বিভ্রান্তিকর কথাগুলো মসজিদে মসজিদে প্রচার-প্রসার করা হচ্ছে, তখন উম্মতকে গুমরাহি থেকে বাঁচানোর জন্যে বিশুদ্ধ এবং সুস্পষ্ট ভাষায় অবস্থান ব্যক্ত করা নিঃসন্দেহে একটি অনিবার্য দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রশ্নের মাঝে ২৯ এপ্রিল ২০২৩ তারিখের যেই বয়ান নকল করা হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ নিরীক্ষণের পূর্বে এ কথা সুস্পষ্ট করা জরুরি যে, দ্বীনের খিদমতে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে সেই বয়ানকারী (মাওলানা সাদ সাহেব) নিজস্ব যেই খেয়াল প্রকাশ করেছেন, এটি তার কোনো নতুন বা প্রথম দ্বীনবিকৃতি নয়; দারুল উলূম দেওবন্দ ও অন্যান্য হকপন্থী উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে পূর্বেও সতর্ক করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও তিনি জনসাধারণের মজলিসে নিজের সেই গুমরাহ চিন্তাধারা কোনো না কোনো শিরোনামের অধীনে ধারাবাহিকভাবে চর্বিত চর্বণ করে যাচ্ছেন। কিন্তু প্রশ্নে

উল্লেখিত বয়ান তার পূর্বের সকল বয়ানের তুলনায় অধিক বিপদজনক। কারণ, তিনি এখানে উলামা, মুহাদ্দিসিনে কেরাম, বুজুর্গানে দ্বীন ও দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর জনগণ কর্তৃক ভরণ-পোষণের প্রচলিত পদ্ধতিকে সুস্পষ্ট শব্দে অপদস্থ করার চেষ্টা করেছেন।

এ কথা স্পষ্ট যে, বয়ানকারী দ্বীনের খিদমতে শতভাগ নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে যেসব ভিত্তিতে (সাহাবায়ে কেরামের সিরাতের অনুসরণ, জনগণ থেকে অমুখাপেক্ষী থাকা, পরিপূর্ণ মুজাহাদা করা, জনগণকে প্র্যাক্টিক্যাল ব্যবসা শেখানো এবং দ্বীনি কাজকর্মে সহায়তা অর্জন করা) ব্যবসা ও জীবিকা উপার্জন করার ওপর উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং জনগণের সামনে এই অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন যে, ছাত্র-শিক্ষক ও দ্বীনের সেবকদের জীবিকার সংস্থান ও ব্যয়ভার নির্বাহের প্রচলিত পদ্ধতি সাহাবায়ে কেরামের সিরাতের পরিপন্থী; তার এসব ভিত্তি ও অনুভূতি শতভাগ ভুল। ভিত্তি যেমন ভুল, তেমনি সীরাতের বাহানা দেওয়াটাও অজ্ঞতাপ্রসূত কথা। সঠিক তথ্য হলো, যেসকল সাহাবি সাধারণ মুসলমানদের দ্বীনি প্রয়োজন পূরণের খিদমতে জড়িত ছিলেন, তাদের জীবিকার দায়িত্ব তখনকার জনগণ পালন করতেন। এটাই ছিল সেই যুগের প্রচলিত পদ্ধতি। বাইতুল মাল থেকে তাদের বেতনভাতা নির্ধারিত ছিল। দ্বীনের সেই সেবকগণ নিজেদের জীবিকার সংস্থানের জন্যে বাইতুল মালের ভাতা গ্রহণ করতেন। আল্লামা আইনি রহ. এর ভাষ্য অনুসারে, সাহাবায়ে কেরামের যুগে এমন ব্যক্তিবর্গের জন্যে ভাতা চালু করা ইজমা' তথা সর্বসম্মত বিধান ছিল। তারা অন্যদের মতো ব্যবসা-বাণিজ্য না করে জনগণের ভরণ-পোষণ মঞ্জুর করেছিলেন এ কারণে যে, এসব ব্যক্তিবর্গ ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িত হয়ে পড়লে দ্বীনের খিদমত যথাযথভাবে পালন করতে ব্যঘাত ঘটবে। এ সম্পর্কে শত শত মুহাদ্দিস, ফকিহ ও জীবনীকারদের সুস্পষ্ট লেখা এত প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে যে, সবগুলো এখানে তুলে ধরা দুরুহ। আমরা নমুনা হিসেবে কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করছি—

সবার আগে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদি. এর সেই পূর্ণ ঘটনা –যার ওপর ভিত্তি করে বয়ানকারী তার ভুল আবিষ্কার (ইজতিহাদ) হাজির করেছেন– তার সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের ব্যাখ্যা দেখুন। হায়াতুস সাহাবার মাঝে সেই ঘটনার বিবরণ হলো—

ردُّ أبي بكر الصديق رضي الله عنه المال، قصةُ ردِّه رضي الله عنه وظيفته من بيت المال، أخرج البيهقي عن الحسن أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنَّ أكيسَ الكَيْس التقوى - فذكر الحديث، وفيه: فلما أصبح غدا إلى السوق فقال له عمر رضي الله عنه: أين تريد؟ قال: السوق، قال: قد جاءك ما يشغلك عن السوق، قال: سبحان الله، يشغلني عن عيالي قال: نفرض بالمعروف؛ قال: ويحَ عمر إني أخاف أن لا يسعني أن آكل من هذا المال شيئاً. قال: فأنفقَ في سنتين وبعض أخرى ثمانية آلاف درهم، فلما حضره الموت قال: قد كنت قلت لعمر: إني أخاف أن لا يسعَني أن آكل من هذا المال شيئاً، فغلبني؛ فإذا أنا متُّ فخذوا من مالي ثمانية آلاف درهم وردوها في بيت المال، قال: فلما أُتي بها عمر قال: رحم الله أبا بكر، لقد أتعب من بعده تعباً شديداً. (حياة الصحابة : ٥١٦/٢، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت)

এ ঘটনা হাদিস ও সিরাতের বিভিন্ন কিতাবে শাব্দিক তারতম্য সহকারে বিবৃত রয়েছে। যার সারাংশ হলো, হযরত আবু বকর রাদি. খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর সাহাবায়ে কেরাম রাদি. সর্বসম্মতিক্রমে বাইতুল মাল থেকে তার বেতন নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি সেই বেতন গ্রহণও করেছিলেন। বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা আবদুল হাই কাত্তানি রহ. তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ نظام الحكومة النبوية/ التراتيب الإدارية এর মাঝে রীতিমত একটি অধ্যায় দাঁড় করিয়েছেন যে, الفصل الأول فى أن لكل من شغل بشيئ من أعمال المسلمين أخذ الرزق على شغله ذلك، والفصل الرابع فى أرزاق الخلفاء بعده صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم. যার অধীনে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদি. এর সেই আলোচিত ঘটনার মাধ্যমে দলিল পেশ করে তিনি লিখেছেন যে, কোনো ব্যক্তি যদি মুসলমানদের সম্মিলিত দ্বীনি খিদমতে জড়িত থাকেন তাহলে তিনি বাইতুল মাল থেকে বেতনের হকদার বিবেচিত হবেন।

যদি বয়ানকারী ব্যক্তি হায়াতুস সাহাবার মাঝে আলোচিত ঘটনার মূল

উৎসগ্রন্থ *সুনানে বাইহাকি* পড়তেন তাহলে দেখতে পেতেন যে, বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকিহ ইমাম বাইহাকি রহ. তাঁর সুনানের মাঝে হযরত আবু বকর রাদি. এর উপর্যুক্ত ঘটনার ওপর এই অধ্যায় দাঁড় করিয়েছেন, **باب ما يكره للقاضى من الشراء والبيع والنظر فى النفقة على أهله، وفى ضيعته لئلا يشغل فهمه.** যার অর্থ হলো, একজন বিচারপতির জন্যে ব্যবসা পেশায় আত্মনিয়োগ করা মাকরুহ, যেন তার মানসিক মনোযোগে ব্যঘাত না হয়।

আল্লামা আইনি রহ. সহ একাধিক মুহাদ্দিস উক্ত ঘটনাকে দলিল হিসেবে পেশ করে লিখেছেন যে, সাধারণ মুসলমানদের দ্বীনি সেবায় নিয়োজিত সকল সদস্য বাইতুল মাল থেকে বেতন গ্রহণ করবেন। তাদের আর্থিক ভরণ-পোষণের দায়িত্ব জনগণকে বহন করতে হবে। এমনকি আল্লামা নাবলুসি রহ. **شرح الطريقة المحمدية** গ্রন্থের মাঝে কাজি খান রহ. ও আল্লামা ইবনু নুজাইম রহ. থেকে নকল করেছেন যে, কোনো ব্যক্তি যদি নিজেকে কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা এবং মুসলমানদের জাতীয় দ্বীনি খেদমতের জন্যে নিয়োজিত করেন তাহলে তিনি পূর্ব থেকে যত বড় ধনীই হোন না কেন; অবশ্যই বাইতুল মালের বেতনের হকদার বিবেচিত হবেন। আমাদের অন্যতম আকাবির হযরত থানভি রহ. লিখেছেন, 'আমাদের ফকিহগণ লিখেছেন যে, বিচারক যদি অনেক বড় ধনীও হন, তবু তার বেতন নেওয়া উচিত। কারণ হলো, যদি কোনো বিচারক বিনাবেতনে দশ বছর দায়িত্ব পালন করে, এরপর তার স্থানে কোনো দরিদ্র বিচারক নিযুক্ত হন তখন তার জন্যে পুনরায় বেতন চালু করা মুশকিল হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ! ফকিহদেরকে আল্লাহ কী পরিমাণ উপলব্ধি ক্ষমতা দিয়েছেন! তারাই তো বাস্তবতার সম্যক জ্ঞানী ছিলেন।' (দাওয়াতে আবদিয়্যাতের উদ্ধৃতিতে আল-ইলমু ওয়াল উলামা : ৩/৩১। প্রকাশনায়– এদারায়ে ইফাদাতে আশরাফিয়া, লাখনৌ)

শাইখুল হাদিস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ. তাঁর 'ফাযায়েলে তিজারাত' গ্রন্থে আলোচিত ঘটনা নকল করার পর বুখারি শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থের উদ্ধৃতিতে লিখেছেন, 'যেসকল ব্যক্তি মুসলমানদের জনকল্যাণে নিয়োজিত, যথা- কাজি, মুফতি, মুদাররিস, তাদের ক্ষেত্রেও একই বিধান।' (ফাজায়েলে তিজারত : ৬৭, মাকতাবাতুশ শায়খ, করাচি)

লক্ষ্য করুন, আল্লামা আইনি রহ. আল্লামা কাত্তানি রহ. শাইখুল হাদিস হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া রহ. সহ অপরাপর হাদিস ব্যাখ্যাকারগণ

এই ঘটনার আলোকে সাধারণ মুসলমানদের দ্বীনি খিদমতে নিয়োজিত সকল ব্যক্তির জন্যে বাইতুল মাল থেকে বেতন গ্রহণ এবং জনগণের ভরণ-পোষণ গ্রহণ করার পক্ষে লিখেছেন। ইমাম বাইহাকি রহ. কাজিগিরি তথা বিচারকার্যের মতো দ্বীনি খিদমতে জড়িত ব্যক্তিদের জন্যে ব্যবসা পেশ গ্রহণ করাকে মানসিক একাগ্রতা বিঘ্নকারী সাব্যস্ত করে মাকরুহ বলেছেন। অথচ সেই একই ঘটনার আলোকে এই বয়ানকারী ব্যক্তি দ্বীনের সেবকদের জন্যে ব্যবসা জরুরি মনে করছেন এবং ব্যবসা না করে দ্বীনি কাজে জড়িত হওয়াকে ত্রুটিপূর্ণ মুজাহাদা সাব্যস্ত করছেন। এটাকে ইস্যু বানিয়ে তিনি দ্বীনের খাদিমদেরকে সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের বিরুদ্ধাচরণকারী অপবাদে অভিযুক্ত করছেন এবং নিজের মনগড়া সিরাতকে আজিমত তথা (শরিয়তের মূল উত্তম বিধান)-এর আহবান দাবি করছেন। লক্ষ্য করুন, এতটুকু পার্থক্যের কারণে পথ কোত্থেকে কোথায় চলে গেছে!

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ কান্ধলভি রহ. 'হায়াতুস সাহাবা' এর মাঝে যেই অধ্যায় দাঁড় করিয়েছেন, তার দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল, সাহাবায়ে কেরামের দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ ও দুনিয়াবিমুখতা ব্যক্ত করা। তিনি বলতে চেয়েছেন যে, হযরত আবু বকর রাদি. যেই ব্যবসার মাধ্যমে অনায়াসে নিজ জীবিকা নির্বাহ করতেন, খিলাফতের দায়িত্বভারের কারণে তিনি তা ত্যাগ করে বাইতুল মালের যৎসামান্য বেতনের ওপর তুষ্ট হয়ে যান। শুধু তাই নয়; শেষ জীবনে তিনি বাইতুল মাল থেকে গ্রহণকৃত বেতনও ফেরত দেওয়ার অসিয়ত করেছিলেন। এটি ছিল তাঁর সুমহান দুনিয়াবিমুখতা ও খোদাভীরুতার স্বাক্ষর। শাইখুল হাদিস হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া রহ.-ও ফাজায়েলে আমলের মাঝে এই ঘটনা সাহাবায়ে কেরামের দুনিয়াবিমুখতার অধীনে নকল করেছেন। দেখুন, ফাজায়েলে আমল, খণ্ড : ১, হেকায়াতে সাহাবা : ৫৭, তৃতীয় অধ্যায় : সাহাবায়ে কেরামের দুনিয়াবিমুখতা ও দারিদ্রের আলোচনা প্রসঙ্গে। হযরত আবু বকর রাদি. এর বাইতুল মাল থেকে বেতন গ্রহণ।

মাসআলাটি স্পষ্ট করার জন্যে এতটুকু বিবরণই যথেষ্ট ছিল। তারপরও আমরা সঙ্গত মনে করছি যে, সবাইকে আশ্বস্ত করার স্বার্থে ইসলামের সোনালি যুগের আরো কিছু উদ্ধৃতি পেশ করব, যেখানে দ্বীনের খিদমতে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের জনগণের ভরণ-পোষণ গ্রহণ ও জীবিকা নির্বাহ প্রসঙ্গে একাধিক মুহাদ্দিস ও ফকিহদের আরো কিছু ভাষ্য উপস্থাপন করব।

বুখারি শরিফে এসেছে : হযরত আবু বকর ও উমর রাদি. বাইতুল মাল থেকে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কাজি শুরাইহ রহ.ও বেতন নিতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনু সা'দি রাদি. হযরত উমর রাদি. এর কাছে এলে তিনি তাকে তাকে বলেন, ‘আমি সংবাদ পেয়েছি যে, আপনি হুকুমতের কাজ করেন; কিন্তু আপনাকে যে বেতন দেওয়া হয় তা গ্রহণ করেন না।’ বললেন, ‘সঠিক।’ জিজ্ঞেস করলেন, ‘কেন?’ তিনি বললেন, ‘আমি নিজেই নিজের জীবিকা নির্বাহ করি। আমার ঘোড়া ও গোলাম আছে। এর বাইরে আমার আরো সম্পদ আছে। এজন্যে আমি চেয়েছি যে, আমার সেবা মুসলমানদের ওপর ব্যয় হোক।’ তখন উমর রাদি. বললেন, ‘এমনটি করবেন না। আমিও অনুরূপ নিয়ত করেছিলাম; কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বারণ করেছিলেন।’

ইমাম বুখারি রহ. باب نفقة القيم للوقف শিরোনামের অধীনে এই হাদিস উল্লেখ করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘আমার উত্তরাধিকারীরা কোনো স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রা বণ্টন করবে না। আমি যা রেখে যাচ্ছি, তা আমার স্ত্রীদের ব্যয়ভারের পরে এবং আমার আমিলদের বেতনের পরে সাদকা।’ এই হাদিসের অধীনে মুল্লা আলি কারি রহ. মিরকাত গ্রন্থের মাঝে এবং শাইখুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া রহ. লামিউদ দারারি গ্রন্থের টীকার মাঝে নকল করেছেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য বনু নাজিরের জমি, যা আল্লাহ তাআলা নবিজিকে ‘ফাই’ হিসেবে দান করেছিলেন। তদ্রূপ খাইবারের জমিও উদ্দেশ্য, যা তিনি গনিমতের অংশ হিসেবে পেয়েছিলেন। তদ্রূপ ফাদাকের অর্ধভূমি উদ্দেশ্য, যা খায়বার বিজয়ের পর নবিজি খাইবারবাসীদের কাছ থেকে সন্ধির মাধ্যমে অর্জন করেছিলেন। এই জমিগুলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খাস বা বিশেষায়িত ছিল। হাদিসে উল্লেখিত ‘আমিল’ দ্বারা উদ্দেশ্য খলিফাতুল মুসলিমিন। বুখারি শরিফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইবনু বাত্তাল রহ. এই হাদিসের মাঝে আলোচিত مؤنة عامل শব্দের অধীনে লিখেছেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমিলদেরকে নিজ পরিত্যাক্ত সম্পত্তির অন্যতম ব্যয়খাত (مصرف) ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ খলিফাতুল মুসলিমিনদেরকে, যারা মুসলমানদের জাতীয় সেবায় নিয়োজিত। কাজেই কোনো ব্যক্তি যদি মুসলমানদের সামষ্টিক কল্যাণের কোনো ক্ষেত্রে নিয়োজিত থাকেন, যেমন, আলেম, কাজি, মুয়াজ্জিন প্রমুখ, তারাও খলিফাতুল

মুসলিমিনের অনুরূপ বাইতুল মাল থেকে প্রদত্ত বেতনের হকদার হবেন।

ইবনুল আসির রহ. তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে লিখেছেন যে, সাইয়্যেদুনা উমর রাদি. মুসলমানদের সম্বোধন করে বলেন, ‘তোমরা নিশ্চয়ই অবগত যে, আমি একজন বণিক ছিলাম। ব্যবসার মাধ্যমে আমার পরিবার-পরিজনের জীবিকার সংস্থান হতো। কিন্তু এখন আমি তোমাদের সেবামূলক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। সেহেতু বাইতুল মাল থেকে আমার বেতন গ্রহণের ব্যাপারে তোমাদের কী অভিমত?’ উত্তরে সাইয়্যেদুনা আলি রাদি. বলেন, ‘হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি নিজের জন্যে ও আপনার পরিবার-পরিজনের জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করুন।’ সকল মুসলমান তার সঙ্গে একমত হন। তখন সাইয়্যেদুনা উমর রাদি. বাইতুল মাল থেকে বেতন গ্রহণ শুরু করেন। ইমাম তাবারি রহ. এর উদ্ধৃতিতে হাফেয ইবনু হাজার রহ. লিখেছেন যে, এই হাদিস থেকে সুস্পষ্ট জানা যাচ্ছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি মুসলমানদের জাতীয় কাজে নিয়োজিত থাকেন তাহলে তিনি বাইতুল মাল থেকে বেতনের হকদার হবেন।

হযরত মাওলানা ফখরুল হাসান গাঙ্গুহি রহ. আবু দাউদ শরিফের টীকায় লিখেছেন যে, এই হাদিস থেকে বুঝে আসে যে, মুসলিম উম্মাহ সংশ্লিষ্ট দ্বীনের সর্বপ্রকার জাতীয় সেবার জন্যে বাইতুল মাল থেকে বেতন গ্রহণ করা জায়েয। যেমন, দ্বীন শিক্ষা দেওয়া, বিচারকার্য পরিচালনা করা ইত্যাদি। ইমামের দায়িত্ব হলো, তিনি বাইতুল মাল থেকে এ ধরনের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের জীবিকা নির্বাহের বন্দোবস্ত করে দেবেন।

আল্লামা বারকুয়ি হানাফি রহ. তার বিখ্যাত গ্রন্থ الطريقة المحمدية এর মাঝে এই বিষয়বস্তুর ওপর রীতিমত একটি শিরোনাম দাঁড় করিয়েছেন, الفصل الثانى فى التورع والتوقى من طعام أهل الوظائف من الأوقاف أو بيت المال। এই শিরোনামের অধীনে তিনি লিখেছেন যে, সন্দেহের বশবর্তী হয়ে বাইতুল মাল থেকে বেতন গ্রহণ না করাটা মূর্খতা। এরপর তিনি খুলাফায়ে রাশেদিন কর্তৃক বাইতুল মালের বেতন গ্রহণের কথা উল্লেখ করে সর্বশেষে লিখেছেন,

> لا فرق بين الوقف وبيت المال وبين غيرهما من المكاسب في الحل والطيب إذا روعي شرائط الشرع، ولا في الحرمة والخبث إذا لم تراع، بل الأولان أشبه وأمثل في زماننا.

অর্থাৎ 'বাইতুল মাল ও ওয়াকফ সম্পত্তির আয় এবং অন্য কোনো মাধ্যমে জীবিকা উপার্জনের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। বরং বাইতুল মাল ইত্যাদির আয় অধিক পবিত্র।'

হাফেয ইবনু আব্দিল বার রহ. *'আল-ইসতিআব'* গ্রন্থে সূত্র সহকারে নকল করেছেন যে, শামদেশের গভর্নরির জন্যে হযরত মুআবিয়া রাদি.-কে সাইয়্যেদুনা উমর রাদি. বার্ষিক দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা বেতন দিতেন। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. *'কিতাবুল খারাজ'* এর মাঝে فصل فى أرزاق القضاة শিরোনামের অধীনে লিখেছেন যে, কোনো ব্যক্তি মুসলমানদের জাতীয় কাজে নিয়োজিত থাকলে বাইতুল মাল থেকে বেতনের হকদার হবেন। এজন্যে যুগে যুগে সকল খলিফার রীতি ছিল যে, তারা বাইতুল মাল থেকে সবসময় কাজিদের বেতন দিতেন।

আল্লামা যায়লায়ি রহ. *'নাসবুর রায়াহ'* গ্রন্থে হযরত উমর রাদি. থেকে নকল করেছেন যে, তিনি দ্বীনি তালিমে নিয়োজিত শিক্ষকদের বেতন নির্ধারণ করেছিলেন। বাস্তবতা হলো, যেমনটি ইমাম যায়লায়ি রহ. *তাবয়িনুল হাকায়িক* গ্রন্থে লিখেছেন যে, বিচারপতিকে বাইতুল মাল থেকে এজন্যে বেতন দেওয়া হয় যে, তিনি মুসলমানদের জাতীয় দ্বীনি সেবায় আটকে আছেন। এভাবে আটকে থাকাটাই ভরণ-পোষণের কারণ। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈদের যুগে বাইতুল মাল থেকে বেতন গ্রহণের প্রচলন ছিল। খোদ সাইয়্যেদুনা আবু বকর রাদি. ও পরবর্তী সকল খলিফা প্রয়োজন পরিমাণ বেতন গ্রহণ করতেন। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, এটি ইজমা' তথা উম্মাহর ঐক্যমতের ভিত্তিতে স্বীকৃত মাসআলা।

হাফেয যাখাভি রহ. লিখেছেন যে, অতীত যুগের কিছু পূর্বসূরি স্রেফ এ কারণে ব্যবসা করতেন যেন নিজ আয় ওই সকল আলিম ও মুহাদ্দিসদের ওপর ব্যয় করতে পারেন, যারা ইলমে দ্বীনের প্রচার-প্রসারের কাজে নিজেদের জীবন নিয়োজিত করে রেখেছেন, যাদের পক্ষে জীবিকা নির্বাহের কোনো অবলম্বন গ্রহণের সুযোগ নেই। সাইয়্যেদুনা ফুযাইল ইবনু আয়ায রহ. থেকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক রহ. বর্ণনা করেছেন যে, 'যদি তুমি ও তোমার সাথী, অর্থাৎ হযরত সুফিয়ান সাওরি রহ. ও হযরত সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ রহ. প্রমুখ না হতেন, তাহলে আমি ব্যবসা করতাম না।

ইবনু আসাকির (৫৭১ হি.) তারিখু দিমাশক গ্রন্থে সূত্র সহকারে বয়ান

করেছেন যে, মদিনা মুনাওয়ারায় তিনজন শিক্ষক শিশুদের পড়াতেন। উমর রাদি. তাঁদের প্রত্যেককে ভরণ-পোষণ হিসেবে মাসিক পনেরো দিরহাম প্রদান করতেন। আবু ওবাইদ কাসিম ইবনু সালাম রহ. ‘কিতাবুল আমওয়াল’ এর মাঝে باب الفرض على تعلم القرآن والعلم এর মাঝে লিখেছেন যে, হযরত উমর রাদি. কয়েকজন গভর্নরকে ফরমান লিখেছিলেন—‘তোমরা লোকদেরকে কুরআন শেখানোর জন্যে বেতন দেবে।’

ইসলামি ইতিহাসের কিংবদন্তীতূল্য লেখক কাজি আতহার মুবারকপুরি রহ. লিখেছেন,

> ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে দেশি-বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্যে খাবার-দাবার ও বসবাসের আনুষ্ঠানিক বন্দোবস্ত ছিল। স্থানীয় শিক্ষার্থী, অর্থাৎ সুফফার সদস্যগণ ও অন্যান্য দরিদ্র-অসহায় মানুষ মসজিদে নববিতে অবস্থান করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অবস্থাসম্পন্ন সাহাবিগণ তাঁদেরকে নিজেদের ঘরে আমন্ত্রণ জানিয়ে আহার করাতেন। সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের জন্যে মসজিদে নববিতে পর্যাপ্ত খেজুরের ছড়া ও পানি রেখে দিতেন। আবু হুরায়রা ও মুআয ইবনু জাবাল রাদি. ছিলেন সেই কাজের ব্যবস্থাপক।
>
> আর বহিরাগত শিক্ষার্থী, অর্থাৎ আশপাশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত সদস্য ও প্রতিনিধিদলের সদস্যগণকে সাধারণত হযরত রমলা বিনতু হারিস রাদি. এর বাড়িতে রাখা হতো। তাঁর সেই বাড়ি ‘দারুয যিয়াফাহ’ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সেখানে একসঙ্গে ছয়-সাতশো মানুষের থাকার বন্দোবস্ত ছিল। তাঁদের খাবার ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করার দায়িত্ব ছিল হযরত বিলাল রাদি. এর জিম্মায়। কিছু সদস্য ও প্রতিনিধিকে অবশ্য অন্যান্য স্থানেও রাখা হতো।’[১]

---

[১]. খাইরুল কুরুন কি দারসগাহেঁ। বইটি আমি অনুবাদ করেছি। মাকতাবাতুল আসলাফ বাংলাবাজার থেকে ‘ইসলামি জ্ঞানচর্চার ইতিহাস’ নামে প্রকাশিত হয়েছে। পৃষ্ঠা নং : ২১৮। - আবদুল্লাহ আল ফারুক

তিনি অন্যত্র লিখেছেন,

> ‘পরবর্তী যুগে যখন ব্যাপক হারে মকতব প্রতিষ্ঠার রেওয়াজ ছড়িয়ে পড়ে তখন প্রতিটি শহর, গ্রাম, মরুগ্রাম ও গোত্রের মাঝে স্বতন্ত্র মকতব গড়ে ওঠে। সমাজের প্রতিটি শ্রেণি নিজ নিজ অভিরুচি ও প্রয়োজন অনুসারে শিশুদের শিক্ষা এবং মকতবের শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের বেতন ও খাবারের বন্দোবস্ত করতো।’[1]

দ্বীনি খিদমতের জন্যে বেতন গ্রহণ এবং বাণিজ্য না করা প্রসঙ্গে হযরত আবু বকর, হযরত উমর রাদি. সহ অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের যেই আমল ছিল এবং এ প্রসঙ্গে সম্মানিত ফুকাহায়ে কেরাম যা লিখেছেন, তার আলোকে হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ. তাঁর সংস্কারধর্মী রচনা ‘ইসলাহে ইনকিলাবে উম্মত’ গ্রন্থে বেশ বিশদাকারে গবেষণামূলক আলোচনা করেছেন। যার সারসংক্ষেপ হলো,

‘আলেম, দ্বীনি শিক্ষার্থী ও দ্বীনি খিদমতে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের আর্থিক সেবা করা সকল মুসলমানের ওপর ওয়াজিব ও জরুরি। এই ভরণ পোষণ হলো এ যুগের অন্যতম অবহেলিত ওয়াজিব, যার দিকে সাধারণত মানুষের দৃষ্টি নেই। ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, কারো সময় আটকে রাখলে তার বিনিময় দিতে হবে। বিচারপতিদের বেতন এ ঘরানার একটি উদাহরণ। তিনি যেহেতু মুসলমানদের সেবায় আটকে আছেন, কাজেই তার ভরণ পোষণ হিসেবে সমস্ত মুসলমানদের সম্পদ বাইতুল মাল থেকে বেতন দেওয়া হয়। তদ্রূপ তালিবুল ইলম ও আলিমদের জীবিকাও মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব। কেননা তারাও জাতির দ্বীনি সেবায় নিয়োজিত। তাদের সময় বন্দি। একটি যুক্তির মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করছি। যদি কোনো জাতির মাঝে একজন চিকিৎসকও না থাকে তখন বিবেক বলে যে, এ মুহূর্তে পুরো জাতির দায়িত্ব হলো, তারা একমত হয়ে কয়েকজন ব্যক্তিকে এই শাস্ত্রের প্রতি মনোযোগী করবে এবং তাদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা তারাই করে দেবে। এই পদক্ষেপ না নেওয়া হলে গোটা জাতি বিপদে পড়বে। যতদিন পর্যন্ত বাইতুল মালের প্রচলন ছিল, ততদিন তার মাধ্যমে মুসলমানদের থেকে এই ভরণ-পোষণ স্বয়ংক্রীয়ভাবে উসুল হয়ে যেতো। কিন্তু বর্তমানে তার বিকল্প হলো,

---

[1] খাইরুল কুরুন কি দারসগাহেঁ বা ইসলামি জ্ঞানচর্চার ইতিহাস। পৃষ্ঠা নং : ৪১৯

মুসলমানরা নিজেরাই উলামা ও তুলাবাদের সেবা করবে। হয় মাদরাসায় দিয়ে আসবে, বা নিজেরাই সরাসরি দেবে। কুরআন কারিমের এই আয়াত لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى الأَرْضِ আমাদের এই আলোচনার সুস্পষ্ট দলিল। কেননা এই আয়াতের لام حرف جر টি হকদার হওয়া বোঝায়। আর أُحصِرُواْ শব্দটি ব্যক্তির সময় আটকে রাখা বোঝায়। فِى سَبِيلِ اللَّهِ এর তাফসির হলো, তালিবুল ইলম– এমনটাই বর্ণিত রয়েছে। لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى الأَرْضِ দ্বারা ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে, তারা জীবিকা উপার্জনের জন্যে সময়-সুযোগ পান না। এত কিছু সত্ত্বেও কেউ যদি তালিবুল ইলম বা উলামায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করে যে, আপনারা আপনাদের জীবিকার কী বন্দোবস্ত করে রেখেছেন? তাহলে সেটা হবে অবান্তর প্রশ্ন। এমন প্রশ্ন তোলার অধিকার তাদের নেই। উপর্যুক্ত আলোচনা সামনে রাখলে ইমাম শাফেঈর মাযহাব অনুসারে ফতোয়া দেওয়ার প্রয়োজন থাকে না। কেননা এই ভরণ-পোষণ ও আর্থিক সংস্থান তো গোটা জাতির ওপর ওয়াজিব দায়িত্ব। হানাফি আলিমদের মতে, এটি হলো অন্যকে নিজ কাজে আটকে রাখার বিনিময়। অন্তত ঝগড়া থেকে নিরাপদ থাকার জন্যে যা নির্ধারিত হওয়া জরুরি। এখন কেউ যদি এই সন্দেহ তোলে যে, উলামায়ে কেরাম কীভাবে নিজের জীবিকা নির্বাহের অবসর পান না? তাহলে তার সেই সন্দেহ হবে বাস্তবতা বিবর্জিত। কেননা যে ব্যক্তি জীবিকা উপার্জনের কাজে ব্যস্ত থাকে, তার কাছে একজন অবসর ব্যক্তির সমান সেবা করার সুযোগ থাকে না। অভিজ্ঞতার আলোকে এটাই প্রমাণিত। আর অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়ে তর্ক করা নিষ্ফল কাজ। আপনি নিজেই লক্ষ্য করুন, তাদের ব্যাপারে কুরআন বলেছে, لاَ يَسْتَطِيعُونَ (তারা জমিনে ঘুরে বেড়াতে সক্ষম নন)। এমন নয় যে, তারা পঙ্গু। বরং তারা হলো, দ্বীনের খেদমতে সীমাহীন ব্যস্ত।' (ইসলাহে ইনকিলাবে উম্মত : ২/১৯০-১৯৩। যাকারিয়া প্রকাশনী, দেওবন্দ। হযরত থানভি রহ. এর লেখা শব্দগুলো ফতোয়ার শেষে উদ্ধৃতিতে পাবেন।)

হযরত থানভি রহ. তাঁর এক ওয়াজে বলেছেন, 'এই আয়াত لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى الأَرْضِ থেকে জানা যায় যে, এই জামাতটির জীবিকা উপার্জনের কাজে বিলকুল লিপ্ত না হওয়াই সমীচীন। لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى الأَرْضِ বাক্যটি সে দিকেই ইঙ্গিত করছে। কাজেই যারা সন্দেহ তোলে যে, আলিমগণ কেন পার্থিব জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রে পঙ্গু– তাদের সেই সন্দেহও প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়। প্রমাণিত হলো যে, উপর্যুক্ত

অর্থে তাদের পঙ্গু হওয়াই জরুরি। তার কারণ হলো, এক ব্যক্তির পক্ষে ভিন্ন দুটি কাজ সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। বিশেষত, কাজটি যদি এমন হয় যে, তার মাঝে সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকা জরুরি।' (আল ইলমু ওয়াল উলামা : ১৬১; হুকুকুল ইলম গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে। পৃষ্ঠা : ১৫)

বাইতুল মাল থেকে সুলতান যেই সম্মানী পান, আর জনগণের চাঁদা থেকে মাদরাসার আসাতিযায়ে কেরাম যেই সম্মানী পান, সেই দুটোর মাঝে সাদৃশ্যের কারণ সম্পর্কে আলোকপাত করে হযরত থানভি রহ. বলেন,

‘রাজকোষ থেকে বাদশাহ সম্মানী পান এ কারণে যে, তিনি জনগণের কাজে ব্যস্ত। আটক। কেননা বাদশাহ তো তিনিই হন, যাকে গোটা জাতি শাসক হিসেবে মেনে নেয়। এমন ব্যক্তি রাজকোষ থেকে সম্মানী পেয়ে থাকেন। আচ্ছা, বলুন তো রাজকোষের এই অর্থ কোত্থেকে আসে? জনগণের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ দিয়েই তো রাজকোষ সমৃদ্ধ হয়। যায়দ এক পয়সা দিলো। উমর এক পয়সা দিলো। বকর এক পয়সা দিলো। তাদের দেওয়া অর্থ যেখানে জমা হয়, সেটাই রাজকোষ। এটাও এক ধরনের চাঁদা। জনগণ থেকে নেওয়া চাঁদা। সেখান থেকে বাদশাহ বেতন পান। রাজকোষ হওয়ার কারণে যার সম্মান বেড়ে যায়। লোকজন সমীহ করে বলে, রাজকোষ। অথচ আদতে সেটা কিন্তু জনগণের চাঁদা। কাজেই বাস্তবতা হলো, মৌলভিগণ একই ধরনের চাঁদা থেকেই বেতন পেয়ে থাকেন।' (আল ইলমু ওয়াল উলামা : ১৬৯; আত-তাবলীগ গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে। পৃষ্ঠা : ২/৭২। এদারায়ে ইফাদাতে আশরাফিয়া, লাখনৌ থেকে মুদ্রিত।)

উপরের সুস্পষ্ট লেখাগুলো থেকে পরিষ্কার হচ্ছে যে, যেসব ব্যক্তি দ্বীনি খিদমতে নিয়োজিত তাদের আর্থিক সংস্থানের বন্দোবস্ত করা সাধারণ মুসলমানদের দায়িত্ব। এ ধরনের ভরণ-পোষণ করা শুধু জায়েযই নয়; শরিয়তের অভীষ্ট লক্ষ্যের অনুসরণও বটে। বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এটাই উত্তম (মুসতাহসান)। সাহাবায়ে কেরাম ও সালফে সালেহীন (অতীতের আদর্শ মনীষা)-এর জীবনীর আলোকে প্রমাণিত। শুধু তাই নয়; আমাদের আকাবির রহিমাহুমুল্লাহ গণচাঁদার ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি মজবুত, সুদৃঢ় ও উপকারী শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসিম নানুতুভি রহ. দারুল উলুম দেওবন্দের জন্যে যেই ‘উসুলে হাশতগানা’ (মূলনীতি অষ্টক) প্রণয়ন

করেছিলেন, তার প্রথম ও দ্বিতীয় ধারায় তিনি অধিক চাঁদার প্রতি মনোযোগ এবং শিক্ষার্থীদের খাবার ও আবাসনের প্রতি উৎসাহিত করার প্রয়াসের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন, যেন তারা দ্বীনের হিফাজত ও প্রচারের কাজ পূর্ণ মনোনিবেশ ও অভিনিবেশ সহকারে আঞ্জাম দিতে পারেন।

এখন বয়ানকারী (মাওলানা সাদ সাহেব) দ্বীনি খিদমতে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে যে এই অজুহাতে ব্যবসা করার দাওয়াত দিচ্ছেন যে, 'তারা যেন নিজেরাই নিজেদের ভরণ-পোষণের বন্দোবস্ত করার মাধ্যমে মাখলুক থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারে এবং তাদের মুজাহাদা যেন কামিল হয়' তার এই বক্তব্য প্রমাণিত করে যে, তিনি নিজেই সীরাত সম্পর্কে অজ্ঞ। দ্বীনের খেদমত করার সময় শতভাগ মনোযোগ নিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বেতন-ভাতা মেনে নেওয়া অবশ্যই ব্যবসা করা থেকে উত্তম। কেউ যদি ইখলাস ও সদিচ্ছার সাথে এই খিদমত আঞ্জাম দেন তাহলে আল্লামা শামি ও হযরত থানভি রহ.-এর সুস্পষ্ট বক্তব্য অনুসারে তিনি দ্বিগুণ সাওয়াবের হকদার হবেন। একটি হলো, দ্বীন প্রচারের সাওয়াব। অন্যটি হলো, পরিবার-পরিজনের জীবিকা সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করা। (দেখুন, ফতোয়ায়ে শামি, আযান অধ্যায়। বেহেশতি যেওর, একাদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৩৮)

এমনকি কিছু কারণে প্রয়োজন না থাকলেও বেতন গ্রহণ করাকে উত্তম অভিহিত করা হয়েছে। এ কারণেই হিদায়া গ্রন্থের লেখক ধনী বিচারপতির বেতন গ্রহণের বিশেষ উপকার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। (আল ইলমু ওয়াল উলামা : ১৭২; আল-কালামুল হাসান গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে। পৃষ্ঠা : ২৩। এদারায়ে ইফাদাতে আশরাফিয়া, লাখনৌ থেকে মুদ্রিত।)

শাইখুল হাদিস হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া রহ. *ফাজায়েলে তিজারত* গ্রন্থে লিখেছেন,

> 'আমি পূর্বেই লিখেছি যে, আমার মতে পেশা হিসেবে ব্যবসা উত্তম। কারণ হলো, ব্যবসার মাঝে ব্যক্তি নিজ সময়ের মালিক থাকে। যার ফলে ব্যবসার পাশাপাশি পঠন-পাঠন, দ্বীন প্রচার ও ফতোয়া প্রদান ইত্যকার কাজও করতে পারে। এ কারণে কেউ যদি দ্বীনি কাজের জন্যে নিজেকে নিয়োজিত করে তবে সেটি ব্যবসা থেকেও উত্তম। শর্ত হলো, দ্বীনের খিদমতই একমাত্র উদ্দেশ্য হতে হবে। বেতনকে রাখবে বাধ্যবাধকতার স্তর

> হিসেবে। আমাদের দেওবন্দি আকাবির রহ.-এর এটাই চিরন্তন অভ্যাস ছিল। তবে তার ভিত্তি হলো, এটাকেই মূল কাজ মনে করবে। বেতনকে মনে করবে আল্লাহর দান। কাজেই কেউ যদি এক জায়গায় দ্বীনি কাজে নিয়োজিত থাকে; পাঠদান, ফতোয়া প্রদান ইত্যকার কোনো পদে নিযুক্ত থাকে, এমন ব্যক্তি যদি অন্য কোনো মাদরাসায় অধিক বেতন পায়, তাহলে যেন স্রেফ বেতনের লোভে পূর্বের খিদমত ত্যাগ না করে।'

দ্বীনি খিদমতে নিয়োজিত থাকার পাশাপাশি ব্যবসা বা অন্য কোনো পেশায় সময় দেওয়াটা মুহাদ্দিস, ফকিহ ও আমাদের আকাবির রহ. এর সুস্পষ্ট বক্তব্য ও অভিজ্ঞতার আলোকে দ্বীনি খিদমতের জন্যে ব্যঘাত সৃষ্টিকারী। এ প্রসঙ্গে শাইখুল হাদিস হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া রহ. লিখেছেন,

> 'কয়েক বছর যাবত আমার অভ্যাস হলো, আমি মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে এই পরামর্শ দিয়ে আসছি যে, আপনারা বিনাবেতনের কোনো শিক্ষক রাখবেন না। আমার মাদরাসার ক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা আপনাদের জানাচ্ছি। প্রথমদিকে আমি মাযাহিরুল উলুমে সহকারী শিক্ষক পদ শুরু করেছিলাম। তাদেরকে পরামর্শ দিতাম যে, মাদরাসায় এক-দুটো সবক পড়াবে, আর অবশিষ্ট সময় নিজস্ব কোনো ব্যবসা করবে। কিন্তু এক বছরের মাথায় দেখা গেল, শিক্ষকতার প্রতি তাদের মনোযোগ কমে গেছে। পুরোদস্তুর ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে দ্বীনি কাজ ছুটে যেতে লাগলো। সাধারণত একজন বিনাবেতনের শিক্ষক যতটা মনোযোগ ছাড়া কাজ করে, বেতনপ্রাপ্ত শিক্ষক ততটা করে না।... এ কারণেই আমাদের আকাবির এই নীতি মেনে চলতেন। হযরত গাঙ্গুহি রহ. কর্মজীবনের শুরুতে সাহারানপুরে দশ রুপি বেতনে শিশুদের পড়ানোর চাকরি করতেন। হযরত নানুতুবি রহ. সম্পর্কেও বলেছি যে, তিনি কিছু দিন হাদিস পড়ানো ও কিতাবের প্রুফ সংশোধনের চাকরিতে বেতন নিয়েছেন। হযরত থানভি রহ.-এর ঘটনা তো সর্ববিদিত যে, তিনি প্রথম জীবনে কানপুরে শিক্ষকতা করেছেন।'
> (ফাযায়েলে তিজারত : ৫২-৬২, মাকতাবাতুশ শায়খ, করাচি)

বয়ানকারী (মাওলানা সাদ সাহেব) তালিবুল ইলম ও উলামায়ে কেরামকে টার্গেট করে তাদের জীবিকার সংস্থান হিসেবে যেই প্রস্তাবনা দিয়েছেন এবং নিজ প্রস্তাবনার জন্যে যেসব বিষয়কে ভিত্তি বানিয়েছেন, আফসোসের বিষয় হলো, দীর্ঘদিন ধরে আধুনিকতাবাদীরা একই রকম অভিমত দিয়ে আসছে। হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি দা.বা. লিখেছেন,

> ‘কিছু লোক দ্বীনি মাদরাসার প্রতি কল্যাণকামিতা ও সহমর্মিতা দেখিয়ে এই প্রস্তাব পেশ করে যে, এই সব বিদ্যাপীঠে হস্তশিল্পসহ অপরাপর কারিগরি বিদ্যার বন্দোবস্ত থাকা উচিত, যেন এখান থেকে শিক্ষাসম্পন্নকারী আলিমগণ জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে সমাজের বোঝা না হয়। যেন অন্যের কাছে হাত পাতার পরিবর্তে নিজ জীবিকার সংস্থান নিজ হস্তবিদ্যার মাধ্যমে করতে পারে এবং কোনো বিনিময় না নিয়ে দ্বীনের খিদমত করতে পারে।
>
> তাদের এই প্রস্তাবনা বাহ্যত যত সুন্দরই মনে হোক; এবং তাদের মনে যত সদিচ্ছাই থাকুক; বাস্তবতার দৃষ্টিতে অবশ্যই অদূরদর্শী ও অগ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ। প্রথম কথা হলো, যদি দ্বীনি মাদরাসার উদ্দেশ্য হয়– কুরআন ও সুন্নাহর গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলিম সৃষ্টি করা তাহলে অবশ্যই এই জ্ঞানের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধনের জন্যে ব্যক্তিকে ষোলোআনা সময় দিতে হবে। বর্তমানে আমাদের জীবন বেশ জটিল হয়ে পড়েছে। অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত যে, কোনো ব্যক্তি যদি কারিগরি বিদ্যায় জড়িয়ে পড়ে তাহলে তার পক্ষে দ্বীনের খিদমত করাটা স্রেফ স্বপ্নে পরিণত হয়। বাকি জীবনে সেই স্বপ্ন আর কখনই পূরণ হবে না। অনেক শিক্ষার্থীকে দ্বীনি ইলমের পাশাপাশি হস্তশিল্প শিখতে দেখা যায়। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় এমনটাই দেখা যায় যে, পরবর্তীকালে কোনো তালিবুল ইলম দ্বীনি ইলমের খিদমতে জড়িয়ে পড়লে তার পক্ষে হস্তশিল্পে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না। আবার কেউ জীবিকার প্রয়োজনে হস্তশিল্পে মনোনিবেশ করলে পরবর্তীকালে দ্বীনি ইলমের সাথে তার সম্পর্ক থাকে না।
>
> অতএব, যেসব মাদরাসা উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন উলামা তৈরি করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাদের জন্যে এই প্রস্তাব অসম্ভব।

নিজ শিক্ষার্থীদেরকে তারা ইলমে দ্বীনের পাশাপাশি কারিগরি বিদ্যা শেখাবে– এটা শোভা পায় না।

কোনো ব্যক্তি যদি সমাজের দ্বীনি প্রয়োজন পূরণ করার বিনিময়ে বেতন বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করে, তাহলে সেটাকে সমাজের বোঝা সাব্যস্ত করা মারাত্মক ভুল চিন্তা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার নীতি হলো, যে ব্যক্তি সেই শাখায় দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে সমাজের সেবা করছে, তার জীবিকা অবশ্যই সেই শাখার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবে। যদি সে ওই শাখায় সমাজের সেবা দেওয়ার ওপর ভিত্তি করে কোনো বেতন বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করে, তাহলে কোনোভাবেই তাকে সমাজের বোঝা ঠাওরানো যাবে না। বরং এটাই তো সামাজিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর ওপর ভর করেই গোটা মানবতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। যেমন ধরুন, প্রত্যেক ডাক্তার, বা ইঞ্জিনিয়ার বা অর্থবিশেষজ্ঞ বা বিজ্ঞানী নিজ শাখায় গোটা সমাজের সেবা করছেন। তার বিনিময়ে সমাজ যদি তাকে আর্থিকভাবে উপকৃত করে তাহলে তাকে কিছুতেই তার ওপর করুণা বলা যাবে না। এটাকে সমাজের ওপর বোঝা তকমা দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে যে, সমাজের কি দ্বীনি ইলমের কোনো প্রয়োজন নেই? কোনো মুসলিম সমাজে কি এমন একজন আলিমের প্রয়োজন নেই, যিনি তাদের সকল দ্বীনি প্রয়োজন পূরণ করবেন? যিনি তাদেরকে নিত্যনৈমিত্তিক মাসআলার ক্ষেত্রে প্রদর্শন করবেন? তাদের বাচ্চাদের দ্বীন শেখাবেন? জনগণের ধর্মীয় ভবিষ্যত হিফাজতের স্বার্থে যিনি নিজ জীবন ওয়াকফ করে দেবেন? যিনি দ্বীনের ওপর নেমে আসা প্রতিটি ফিতনাকে সমূলে উপড়ে ফেলবেন?

এগুলো যদি কোনো মুসলিম সমাজের সর্বাধিক জরুরত হয়ে থাকে, তাহলে যিনি নিজের জীবিকার সংস্থানের ফিকির বিসর্জন দিয়ে মুসলিম সমাজের সেবা করে যাচ্ছেন, সমাজ কর্তৃক তার বিনিময় হিসেবে ভরণ-পোষণের যোগান দেওয়াটা এমন কী ইহসান! এটাকে কেউ যদি সমাজের বোঝা বা অন্যের কাছে হাত

> পাতা বলে, এবং তাকে নিজ জীবিকা প্রতিপালনের স্বার্থে হস্তবিদ্যা শেখার পরামর্শ দেয়, তাহলে তা হবে অত্যন্ত বাজে ভাবনা।' (হামারা তা'লীমী নিযাম : ৮৮-৯০, যমযম বুকডিপো, দেওবন্দ)

মোটকথা, উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে এ কথা পরিষ্কার হলো যে, বয়ানকারী (মাওলানা সাদ সাহেব) সাইয়্যেদুনা আবু বকর রাদি. এর ঘটনা থেকে যেই অবাস্তব ইজতিহাদ ও মতবাদ আবিষ্কার করেছেন, তা শতভাগ ভুল। হায়াতুস সাহাবা গ্রন্থের শিরোনাম ও মূল ঘটনার সাথে তার দাবির মোটেও মিল নেই। তার এই দাবিকে আমরা প্রচণ্ড দুঃসাহসের প্রকাশ বলতে পারি। তিনি দাবি করেছেন, শত শত বছর ধরে প্রায় সকল পূর্ববর্তী মনীষী সাহাবায়ে কেরামের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন এবং নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে অপব্যাখ্যা দিয়ে শরিয়ত পরিপন্থী কাজকে শরিয়তের অংশ বানানোর অপরাধে অভিযুক্ত। গোটা উম্মত বিগত চৌদ্দ শতাব্দী ধরে অপব্যাখ্যাপ্রেমী আলিমদের আগ্রাসনের শিকার। এর বিপরীতে যারা আজিমত (উত্তম)-প্রেমী, তাদের পরম্পরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং এখনো বিচ্ছিন্ন আছে।

মাওলানার এই অপবাদ নিঃসন্দেহে আমাদের আকাবির ও আসলাফ (সুমহান পূর্বসূরি)-দের ওপর নির্জলা অপবাদ। সকল আলিম 'রুখসত' (শরিয়তের বিকল্প ছাড় বিধান)-এ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন– এটা কত বড় কঠিন আক্রমণ! উপরন্তু তিনি বলছেন যে, সেই আকাবির উলামা এতোটাই অপব্যাখ্যাপ্রেমী অলস হয়ে পড়েছেন যে, এখন তার হক কথা শুনলে তারা সবাই তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন। এজন্যেই তারা তার বিরোধিতায় উঠে-পড়ে লেগেছেন।

বয়ানকারীর উপর্যুক্ত বয়ানের পরিণতি বিচার করুন। সমাজের যেই লোকগুলো তার কথাকেই চূড়ান্ত মনে করে, তারা স্রেফ সেসব আলিমকেই শ্রদ্ধার চোখে দেখবে, যাঁরা ব্যবসায় জড়িত। এর বাইরে যাঁরা তাদের মনগড়া মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হবে না, তাঁদের সবাই তাদের দৃষ্টিতে মূল্যহীন হয়ে পড়বে। 'দ্বীনি খিদমতের জন্যে বেতন গ্রহণ করলে মুজাহাদা ক্রটিপূর্ণ হয়ে যায়' বয়ানকারীর এমন বক্তব্যের কারণে হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রাদি. এর মতো সুমহান মনীষীও আক্রান্ত হবেন। কেননা, বাইতুল মাল থেকে বেতন গ্রহণের কারণে তাদের মুজাহাদাও ক্রটিপূর্ণ হয়ে গেছে।

নাউযুবিল্লাহ। অথচ বাস্তবতা হলো, পূর্বের ব্যবসা-বাণিজ্যের পাট গুটিয়ে মামুলি বেতন নিয়ে সার্বক্ষণিকভাবে মুসলমানদের জাতীয় সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করার মাধ্যমে তাঁরা উঁচু স্তরের আজিমতের পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান যুগেও যেসকল তালিবুল ইলম, উলামায়ে কেরাম, মুহাদ্দিসিনে কেরাম ও খাদিমগণ মহান পূর্বসূরিদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে পার্থিব জীবিকা বিসর্জন দিয়ে মামুলি বেতনের বিনিময়ে ইলমে দ্বীনের প্রচার ও হিফাজতের কাজে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করছেন, নিঃসন্দেহে তারা আজিমতের নিখাদ উদাহরণ।

২৯ এপ্রিল ২০২৩ ই. তারিখে বয়ানকারীর প্রদত্ত বয়ানের ওপর ভিত্তি করে আমরা আমাদের এই পর্যালোচনা পেশ করলাম। যা আপনারা আপনাদের প্রশ্নে উল্লেখ করেছেন। নাজুক প্রসঙ্গ হওয়ায় আমাদের পর্যালোচনা খানিকটা দীর্ঘ হয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সেই বয়ানকারী সামষ্টিকভাবে যেই চিন্তা-চেতনা লালন করে থাকেন এবং তার অনুসারীদের পক্ষ থেকে যা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়ানো হচ্ছে, সেসব ভুল দলিল-প্রমাণের পর্যালোচনা নেওয়া এমনিতেই জরুরি ছিল। এই আলোচনার পর তার অন্য কোনো বয়ানের নিরীক্ষণ পেশ করার প্রয়োজনীয়তাও থাকে না। এতদসত্ত্বেও আমরা অধিকতর বিশ্লেষণ ও পূর্ণাঙ্গ প্রমাণ উপস্থাপনের স্বার্থে আরেকটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা তুলে ধরছি।

ভুপালের উলামায়ে কেরামসহ অন্যান্য মুফতিয়ানে কেরাম তার যেসব বয়ান প্রেরণ করেছেন, সেগুলো গভীরভাবে পর্যালোচনা করার পর আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, সেই বয়ানকারী নিজের একান্ত ব্যক্তিগত মতবাদ ও তাহরিফাত (দ্বীনবিকৃতি) উম্মতের মাঝে চালু করার জন্যে ‘সীরাতে সাহাবা’ এর চটকদার শিরোনাম ব্যবহার করে থাকেন। সীরাত ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলির ক্ষেত্রে মহান পূর্বসূরিগণ যেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা বিসর্জন দিয়ে তিনি নিজ মস্তিষ্ক ব্যবহার করে সরাসরি আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করছেন এবং উম্মতকেও সরাসরি সীরাতের ওপর গবেষণা করার দাওয়াত দিচ্ছেন। একাজে তিনি সর্বশক্তি ব্যয় করে যাচ্ছেন। আপনি লক্ষ্য করুন, তিনি তার বয়ানগুলোতে এসব বাক্য বলে থাকেন,

آپ ذرا غور کریں سیرت پر —‘আপনি সীরাতের ওপর ভেবে দেখুন’

پکی بات، آپ دیکھ لو سیرت میں —‘এটাই চূড়ান্ত কথা। আপনি নিজেই সীরাতের মধ্যে দেখে নিন।’

میں کہ رہا تھا سیرت سیرت، اسی میں ترقی ہے، اسی میں حفاظت ہے کام کی بھی، کام کرنے والوں کی بھی، —‘আমি বারবার বলি যে, সীরাত সীরাত। এই সীরাতের মাঝে মেহনতের উন্নতি ও নিরাপত্তা নিহিত রয়েছে। মেহনতকারীদের হিফাজতও এর মাঝে নিহিত।’

محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سیرت کے تابع ہو —‘এই মেহনত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবিদের সীরাতের অনুগামী থাকবে।’

"سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے کام کو سیرت کے تابع کرو" —‘সবচেয়ে বুনিয়াদি বিষয় হলো, এই মেহনতকে সীরাতের অনুগামী বানাও।’

"میں رات پہ یہ عرض کر رہا تھا کہ لاعلمی اور سیرت سامنے نہ ہونا اور اپنے معمول اور تجربات کی روشنی میں کام کرنا آدمی کو ایسی چیز کی مخالفت پر ڈال دیتا ہے کہ جو.براہ راست سنت سے ثابت ہے، اس میں بہت ڈرنا چاہئے" —‘আমি রাতে বলেছিলাম যে, অজ্ঞতা, সীরাত সামনে না থাকা, নিজের অভ্যাস ও অভিজ্ঞতার আলোকে কাজ করা– এগুলো ব্যক্তিকে সরাসরি সীরাত থেকে প্রমাণিত বিধানের বিরোধিতা করতে প্ররোচিত করে। কাজেই সতর্ক হোন।’

"نفر سے ہٹ کر دعوت کا کوئی تصور نہیں، دور صحابہ میں نفر سے ہٹ کر دعوت کا کوئی تصور نہیں، آپ خود دیکھ لیں سیرت" —‘গণ অংশগ্রহণের আহবান থেকে সরে দাওয়াতের কল্পনাও করা যায় না। সাহাবায়ে কেরামের যুগে এ ধরনের কোনো দাওয়াতের কল্পনাও ছিল না। আপনি নিজেই সীরাতের মাঝে দেখে নিন।’

"میں نے خوب غور کرلیا صحابہ کی سیرت میں کہ دعوت میں اتباع سنت ہی اصل باطل کے مرعوب ہونے کا سبب تھا" —‘আমি সাহাবায়ে কেরামের সীরাত

> গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করে দেখিছি যে, দাওয়াতের মাঝে সুন্নতের অনুসরণ থাকাটাই বাতিলের প্রভাবিত হওয়ার কারণ।’

> " دعوت کے کسی بھی عمل کو یہ سوچ کر چھوڑ دینا کہ اس پر سب متفق نہیں ہے، یہ براہ راست محمد اور آپ کے صحابہ کے عمل کا انکار ہوگا" —‘সবাই একমত নন; এই অজুহাতে দাওয়াতের কোনো আমল ছেড়ে দেওয়া নিঃসন্দেহে সরাসরি মুহাম্মাদ সা. ও তাঁর সাহাবিদের আমলের অস্বীকার।’

> "میں کل بھی عرض کیا تھا کہ جو بات بھی عرض کی جائے، اس کو خود صحابہ کی سیرت میں تلاش کرو: اس لئے کہ جتنا سیرت کو دیکھوگے اتنی بصیرت کام میں بڑھیے گی" —‘আমি কালকেও এ কথা বলেছি যে, কেউ কোনো কথা বললে তা আপনি নিজেই সাহাবায়ে কেরামের সীরাতের মাঝে অনুসন্ধান করুন। কারণ, আপনি যত বেশি সীরাত পাঠ করবেন, তত বেশি মেহনতের মাঝে প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পাবে।’

> میں کیا بتاؤں آپ سب کو ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم دعوت کے کام کو اپنی عقل اپنی سمجھ سے لے کر چلنا چاہتے ہیں: حالانکہ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس دعوت کے کام کو صحابہ کی سیرت میں دیکھو" —‘আপনাদেরকে আমি কী আর বলব। আমাদের সমস্যা হলো, আমরা নিজস্ব বুদ্ধি ও উপলব্ধির আলোকে এই মেহনতের সাথে চলতে চাই। অথচ সবার দায়িত্ব হলো, দাওয়াতের এই কাজকে সাহাবিদের সীরাতের মাঝে দেখবে।’

> "میں نے عرض کیا کہ ایسی ناراضگی کی مثال نہیں ملتی صحابہ کی سیرت میں، جیسی ناراضگی اللہ کے راستے میں نکلنے کی تاخیر پر ہوئی ہے" —‘আমি বলি- আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার ক্ষেত্রে দেরি করার কারণে যে পরিমাণ ক্রোধ নেমে এসেছে, সাহাবায়ে কেরামের সীরাতের মাঝে অন্য কোনো ক্ষেত্রে এরকম ক্রোধ পরিলক্ষিত হয়নি।’

এগুলোই হলো সকল তাহরিফ তথা দ্বীনবিকৃতির বুনিয়াদ বা উৎস। আপনি গভীরভাবে দেখুন, তার সকল গুমরাহ দৃষ্টিভঙ্গির নেপথ্যে সাধারণত সীরাত বা ইতিহাসের এমন কোনো ঘটনা পাবেন, যা থেকে তিনি ভুল অর্থ

বুঝেছেন, বা সীরাতের অন্যান্য বর্ণনাগুলোকে সামনে রাখেননি, বা উসুলে ফিকাহ পড়ুয়া না হওয়ার কারণে ইস্তিম্বাত তথা উদ্ভাবন করার ক্ষেত্রে ভুল করেছেন, বা ত্রুটিপূর্ণ ও প্রত্যাখ্যাত বর্ণনাকে সঠিক মনে করেছেন। সেই ধারাবাহিকতায় তিনি হযরত আবু বকর রাদি. এর ঘটনা থেকে প্রথমত ভুল বুঝেছেন, এরপর সেখান থেকে ভিত্তিহীন কথাবার্তা বের করে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে টার্গেট বানিয়েছেন। যা তার তাহরিফাতের জ্বলন্ত উদাহরণ।

তিনি (মাওলানা সাদ সাহেব) দ্বীন ও দ্বীনি দাওয়াতের একটি কল্পিত মনগড়া খসড়া মনের মধ্যে বানিয়ে নিয়েছেন। আর সেটাকেই সুন্নত মনে করেন। সেটাকেই তিনি সীরাত আখ্যা দিয়ে শিক্ষা-দীক্ষা ও দাওয়াতের অন্যসকল শরিয়তসম্মত বৈধ পদ্ধতিগুলোকে প্রকাশ্যে ভুল অভিহিত করে বেড়াচ্ছেন। তিনি মনে করেন, নবিজির যুগে শিক্ষা-দীক্ষার পূর্ণ কাঠামো মসজিদ থেকে পরিচালিত হতো। যখন থেকে সেই কাঠামো মসজিদের বাইরে স্থানান্তরিত হয়েছে, তখন থেকে জনগণের মাঝে অজ্ঞতা ছড়িয়ে পড়েছে। এজন্যে তিনি সর্বসম্মুখে এ কথা বলার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছেন যে, আজ আন্তর্জাতিকভাবে দাওয়াত ও তালীমের মেহনত সুন্নত থেকে সরে পড়েছে। দাওয়াত ও তালীমের ব্যবস্থাপনা সুন্নাহপরিপন্থী হওয়ার কারণে কোনো উপকার বয়ে আনছে না এবং কোনো প্রভাব ফেলছে না। তিনি তার এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রমাণিত করার জন্যে নবিজির যুগের বিকৃত চিত্র উম্মাহর সামনে পেশ করছেন। তার বয়ানের এই চয়নিকা লক্ষ্য করুন–

> ‘রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালীম-তারবিয়াত (শিক্ষা-দীক্ষা)-এর একটি সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষা-দীক্ষার এই ব্যবস্থাপনাকে নবিজি ইবাদতের মতো মসজিদের সঙ্গে জুড়ে দেন। এখন কেউ যদি শিক্ষাব্যবস্থাকে মসজিদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাহলে তা হবে তালীম (শিক্ষা) ও তারবিয়াত (দীক্ষা)-এর মাঝে ফারাক করা। মসজিদ থেকে শিক্ষাব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্ন করার অর্থ হলো, শিক্ষা ও দীক্ষার মাঝে ব্যবধান করা হলো। কথাগুলো আপনাদের সবাইকে পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে। কারণ, এ দুটো অর্থাৎ শিক্ষা ও দীক্ষা একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই তালীমি ও তাবিয়াতি (শিক্ষামূলক ও প্রশিক্ষণমূলক) ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন,

সেই ব্যবস্থাপনা শতভাগ মসজিদনির্ভর ছিল। মসজিদের সাথে পুরোপুরি যুক্ত ছিল।’

‘আমি আল্লাহর কসম করে বলছি– যদি সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ সুন্নতের ওপর চলে আসে। এ নিয়ে আমার প্রচণ্ড কষ্ট ও অভিযোগ রয়েছে যে, যেই তালীম ও দাওয়াত ছিল নবিজিকে প্রেরণের অন্যতম দুটি বুনিয়াদি দায়িত্ব, আমি আন্তর্জাতিক স্তরে বলছি যে, এই দুটি দায়িত্ব সুন্নত থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। এ কারণে সুন্নত থেকে বিচ্যুত তালীমের মাঝে তরবিয়াত (দীক্ষা ও প্রশিক্ষণ) নেই। আর সুন্নত থেকে বিচ্যুত দাওয়াতের মাঝে ঈমান নেই। পরিপূর্ণ ঈমান ও পরিপূর্ণ শিক্ষাদান– এ দুটো জিনিস বর্তমান সময়ে আন্তর্জাতিকভাবে সুন্নত থেকে বিচ্যুত।’

‘আমার কথা মনোযোগ সহকারে শোনো, নামায হলো মসজিদের যিমনি (প্রাসঙ্গিক ও অন্যের অধীনস্থ) আমল। নামায মসজিদের যিমনি আমল। নামায মসজিদের যিমনি আমল। মসজিদে ঈমান ও ইলমের মজলিস বসতো। মাঝপথে সবাই নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। হযরত উমর রাদি. বয়ান করছিলেন। মাঝপথে বললেন, ‘এখন নামায পড়ে নাও।’ যার অর্থ হলো, নামায জলসার মাঝখানে চলে আসতো।’

‘এখন আমার কথা অনেক তেতো লাগবে। কিন্তু আপনি তিরমিযি শরিফের এই রেওয়ায়েত দেখুন। আল্লাহ ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামকে হুকুম করলেন যে, আপনি বাইতুল মাকদিসে বনু ইসরাইলকে একত্র করুন। তাদের সমবেত করে আপনি পাঁচ কথা পৌঁছিয়ে দিন। আপনি লক্ষ্য করে দেখুন, হাদিসের প্রথম কথা হলো, ‘আপনি একত্র করুন।’ এভাবে বলা হয়নি যে, জলসার তারিখ বা একত্র হওয়ার তারিখ কোনো পত্রিকায় লিখে দিন, বা ঘোষণা করে দিন যে, অমুক তারিখে সেখানে একত্রিত হতে হবে। সবাই একত্র হোন। দ্বিতীয় কথা হলো, মসজিদে একত্রিত করুন। কোনো মাঠ, বা হোটেল বা ঘরে একত্র হতে বলা হয়নি। বরং হুকুম করা হয়েছে যে, কোথায় একত্র করুন?’

> ‘নামাযে কামাল (পূর্ণতা) আসবে দুটি জিনিসের মাধ্যমে। একটি হলো ঈমান, অন্যটি ইলম। প্রতিটি ইবাদতের মাঝে কামাল (পূর্ণতা) সৃষ্টির জন্যে, প্রতিটি আমল কবুল হওয়ার জন্যে এ দুটিই প্রধান। আর এ দুটো শেখার জায়গা হলো মসজিদ। ঈমান ও আমল শেখার জায়গা মসজিদ। ইলম ও ঈমান শেখার জায়গা মসজিদ। মসজিদ থেকে ইলম শেখা এতো বেশি প্রভাব বিস্তারকারী যে, জনৈক সাহাবি মসজিদে থাকাবস্থায় শুনতে পেয়েছিলেন যে, পর্দার বিধান এসেছে। তিনি গিয়ে মহল্লার মাঝে ঘোষণা করলেন, সঙ্গে সঙ্গে সকল মহিলা পর্দার মধ্যে চলে আসে। একসাথে পুরো মহল্লা পর্দানশীন হয়ে যায়।’
>
> ‘আমি আপনাদেরকে আসল কথা বলছি। যেসব কাফের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে জীবন বাঁচাতে পালাতে উদ্যত হতো, সাহাবায়ে কেরাম তাদেরকে বেঁধে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে আসতেন গোলাম বানানোর জন্যে নয়; বরং কুরআনের জলসায় বসানোর এবং মসজিদের মাঝে আমলের পরিবেশে বসানোর জন্যে। যেন, তাদের কানে কুরআনের আওয়াজ পড়ে, ফলত তাদের অন্তর থেকে কুফরের অন্ধকার নিঃশেষ হয় এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। তোমাদেরকে আমার কথা মনোযোগের সাথে শুনতে হবে।’

অথচ নবিজির যুগে, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈদের যুগে, অর্থাৎ ইসলামের সোনালি যুগে মসজিদের বাইরেও তালীম ও দাওয়াতের বন্দোবস্ত প্রচলিত ছিল। মদিনা মুনাওয়ারাতে শিক্ষাদানের জন্যে মসজিদের বাইরে রীতিমত একটি ঘর নির্ধারিত করে দেওয়া হয়। লোকেরা সেখানে গিয়ে কুরআন কারিম শিখতো। বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা আবদুল হাই কাত্তানি রহ. তার বিখ্যাত গ্রন্থ نظام الحكومة النبوية / التراتيب الإدارية এর মাঝে রীতিমত এই শিরোনাম লিখেছেন, اتخاذ الدار ينزلها القراء، ويستخرج منه اتخاذ المدارس। সেখানে তিনি হাফেয ইবনু আবদিল বার রহ.-এর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ الاستيعاب في معرفة الصحابة এবং طبقات ابن سعد গ্রন্থদ্বয়ের উদ্ধৃতিতে লিখেছেন যে, ‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতুম রাযি. বদর যুদ্ধের অল্প কিছু দিন পরে হযরত মুসআব ইবনু উমাইর রাদি.-এর সঙ্গে মদিনা মুনাওয়ারায় আগমন করেন এবং ‘দারুল কুররা’ গৃহে অবস্থান করেন। এই

'দারুল কুররা' ছিল হযরত মাখরামা ইবনু নওফেল রাদি. এর বাড়ি। সেখানে শিক্ষাদান হতো। সেই ঘটনার আলোকে উলামায়ে কেরাম মাদরাসা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি প্রমাণিত করেছেন। এরপর আল্লামা কাত্তানি রহ. হযরত ইবনু কুদামা মাকদিসি রহ. এর গ্রন্থ 'আল-ইসতিবসার' এর উদ্ধৃতিতে লিখেছেন যে, হযরত মুসআব ইবনু উমাইর রাদি. মদিনা মুনাওয়ারায় হযরত আসআদ ইবনু যুরারা রাদি. এর গৃহে ওঠেন। এরপর এই দু'জন আনসার সাহাবিদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কুরআন কারিম পড়াতেন ও তাদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতেন।'

প্রসঙ্গত এখানে একটি মূলনীতি স্পষ্ট করা সঙ্গত মনে করছি যে, সাহাবায়ে কেরাম রাদি. এর জীবনাদর্শ নিঃসন্দেহে দ্বীন ও শরিয়তের প্রমাণ ও বুনিয়াদ। কিন্তু মনে রাখতে হবে, যেভাবে কুরআন ও সুন্নাহ বিশুদ্ধভাবে বোঝার জন্যে কিছু মূলনীতি ও শর্তাবলি রয়েছে, তদ্রূপ সাহাবায়ে কেরামের জীবনের কোনো আংশিক ঘটনাকে উম্মতের সামনে উপস্থাপন করা এবং বর্তমান পরিস্থিতিকে সাহাবায়ে কেরামের জীবনাদর্শের আলোকে উপস্থাপন করে উম্মতের জন্যে কর্মপন্থা চূড়ান্ত করারও কিছু মূলনীতি ও বিধি-বিধান রয়েছে। এ কারণেই ফুকাহায়ে কেরাম কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের বাণী, কর্মকাণ্ড ও জীবনাদর্শের আলোকে ইসলাম ধর্মের সকল শাখার ছোট-বড় সকল বিধান সংকলন করে দিয়েছেন। যেহেতু সাহাবায়ে কেরামের অভিমতগুলো মুজতাহিদ ইমামগণের তত্ত্বাবধানে আলাদা আকারে সংকলিত হয়নি, এজন্যে ফিকহ ডিঙিয়ে স্রেফ বর্ণনামূলক ভাণ্ডার থেকে সাহাবায়ে কেরামের কিছু বাণী ও কিছু ঘটনা থেকে ইজতিহাদ শুরু করা; বিশেষ করে ইজতিহাদকারী ব্যক্তি যদি স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী হয়, তাহলে তা ফিতনার ভয়াবহ দুয়ার খুলে দেবে। এ কারণেই আল্লামা মুনাভি রহ. তাঁর বিখ্যাত রচনা 'ফাইযুল কাদির' এর মাঝে ইমাম রাযি রহ. এর উদ্ধৃতিতে মুহাক্কিক আলিমদের এই সর্বসম্মত বিধান নকল করেছেন যে, 'সাহাবায়ে কেরামের সরাসরি তাকলিদ (অনুসরণ) করা জনগণের জন্যে নিষিদ্ধ।' (ফাইযুল কাদির : ১/২১০; মিসর; মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা : ৩/১৭১, ১৭৫; উসুলুল ইফতা ওয়া আদাবুহু : ২৫৬)

তার কারণ এ নয় যে, সাহাবায়ে কেরাম অনুসরণযোগ্য নন, নাউযুবিল্লাহ। বরং তার কারণ হলো, শীর্ষ সাহাবায়ে কেরামের কথা, বা কাজ, বা তাদের সীরাত সরাসরি বুঝতে গেলে ভুল হওয়ার প্রবল শঙ্কা রয়েছে। কোনো ব্যক্তি

নিজ মূর্খতা বা জ্ঞানস্বল্পতার কারণে সাহাবায়ে কেরামের সীরাত বিশুদ্ধভাবে বুঝতে ব্যর্থ হওয়ার যথেষ্ট শংকা রয়েছে। বা তাদের কথা ও কর্মের মূল উদ্দেশ্য নিরুপণ করতে ব্যর্থ হতে পারে। তার কারণ হলো, সাহাবায়ে কেরাম রাদি. এর মাযহাব সরাসরি পরিশোধিত ও সুসংবদ্ধ আকারে বিদ্যমান নেই; তা চার মাযহাবের মাঝে ঢুকে পড়েছে। (আল-মাজমু‘ শরহুল মুহাযযাব লিন নববি : ১/৯১ فصل في آداب المستفتي; আল-বুরহান ফি উসুলিল ফিকহ লিল-জুওয়াইনি)

তার জ্বলজ্যন্ত উদাহরণ হলো, বয়ানকারী (মাওলানা সাদ সাহেব) হযরত আবু বকর রাদি. এর আলোচিত ঘটনা থেকে যা আবিষ্কার করেছেন এবং যেভাবে আবিষ্কার করেছেন, তা সামনে রাখলে হযরত ফুকাহায়ে কেরামের দূরদর্শিতা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, কোন কল্যাণের দিকে তাকিয়ে তারা সরাসরি সাহাবায়ে কেরামের বাণীর তাকলিদ করতে বারণ করে থাকেন। আলোচিত ঘটনাতে তিনি শুধু ‘হায়াতুস সাহাবা’ এর মাঝে উল্লেখিত বর্ণনা পড়েছেন; এমনকি মূল উৎস কিতাবের শরণাপন্ন হননি। এই প্রসঙ্গের সমস্ত বর্ণনাকে সামনে রাখা তো অনেক পরের কথা। এরপর সকল বর্ণনার মধ্য হতে কোনটি শুদ্ধ, কোনটি অশুদ্ধ, কোনটি ত্রুটিযুক্ত, আর কোনটি ত্রুটিপূর্ণ- সেগুলোর মাঝে পার্থক্য করা তো আরো অনেক ঊর্ধ্বের বিষয়। কোনো বর্ণনাকারী মূল বর্ণনা নকল না করে ভাবার্থ নকল করতে তার পরিণতি কী হতে পারে, তা বোঝার জন্যে গভীর ইলম লাগে।

শুধু এতটুকুই নয়; সেই বয়ানকারী ব্যক্তি সেই বর্ণনার মাঝে নিজের পক্ষ থেকে অনেকগুলো কথা সংযুক্ত করে দিয়েছেন। তিনি বলছেন যে, حضرت ابو بکر صدیق کا عمل بتلا رہا ہے کہ عمر خلافت مجھے تجارت سے نہیں روک سکتی —“আবু বকর সিদ্দিক রাদি. এর আমল বলছে যে, ‘উমর, খিলাফত আমাকে ব্যবসা থেকে বাঁধা দিতে পারবে না।’ বাজারের দিকে গমন করাটাকেই তিনি আবু বকর রাদি. এর দিকে সম্বন্ধিত করে দিলেন। কিন্তু হযরত উমর ফারুক রাদি. সকল সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করে একমত হয়ে পুরো খিলাফতকাল যে তাঁকে বাণিজ্য থেকে বিরত রাখলেন, এটাকে তিনি হযরত আবু বকর রাদি. এর দিকে সম্বন্ধিত করলেন না। অথচ তার থেকে বুঝে আসে যে, বাণিজ্যকে তাঁরা দেশশাসনের কর্মকাণ্ডের প্রতিবন্ধক মনে করতেন। আবু বকর রাদি. তো সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, لقد

علم قومی أن حرفتی لم تكن تعجز عن مؤنة أهلی، وشغلت بأمر المسلمين.

শুধু এতটুকুই নয়; ওই বয়ানকারী হযরত আবু বকর রাদি. এর দিকে সম্বন্ধিত করে বললেন যে, ‘হযরত আবু বকর রাদি. বললেন, বাণিজ্য কেন ব্যঘাত সৃষ্টিকারী হবে! এই কাজ (খিলাফত)-ও করব, বাণিজ্যও করব।’ এটি বানোয়াট সম্বন্ধ, যা বয়ানকারী জুড়ে দিয়েছেন। এই যে বয়ানকারীর পক্ষ থেকে বানোয়াট সংযোজন– এটি কোনো নতুন ঘটনা নয়। তিনি প্রায়শই নিজ আবিষ্কৃত বানোয়াট বিধানের পক্ষে দলিলবাজি করার সময় হাদিস, আসার ও সীরাতের ঘটনাবলির মাঝে নিজের পক্ষ থেকে পরিবর্তন ও সংযোজন নিয়মিতই করে থাকেন। তার বয়ানসমূহের মাঝে এমন অসংখ্য উদাহরণ পাবেন। তিনি প্রথমত : ঘটনা সংশ্লিষ্ট সকল বর্ণনার তাহকিক (তাত্ত্বিক গবেষণা) করতে অক্ষম। দ্বিতীয়ত : বর্ণনার মাঝে নিজের পক্ষ থেকে সংযোজন করতে অভ্যস্ত। তৃতীয়ত : বর্ণনা বোঝা ও উপলব্ধি করার যোগ্যতা কম। এই তিন-তিনটি কারণে তিনি এমন অগভীর ও ভুল ইজতিহাদ করে থাকেন যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ফকিহদের বিপরীত অবস্থানে পৌঁছে যান। হায়, তিনি যদি সাইয়্যেদুনা হযরত উমর রাদি. এর কথা রাখতেন যে, لَوْ كُنْتُ أُطِيْقُ الْأَذَانَ مَعَ الْخِلَافَةِ لَأَذَنْتُ (মুসান্নাফে ইবনু আবি শায়বা : ২৩) দেখুন, হযরত উমর রাদি. খিলাফতের বোঝা বহনের পাশাপাশি আযানের যিম্মাদারি পালন করতে নিজেকে অক্ষম মনে করছেন। অথচ বয়ানকারী অবলীলায় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদি. এর ব্যাপারে মন্তব্য করছেন যে, তিনি পুরো দুনিয়ার শাসনকার্য পরিচালনার পাশাপাশি বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়াকেও সম্ভব মনে করছেন। কী তাজ্জবের কথা!

আমাদের এই বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে এ কথা স্পষ্ট হলো, আলোচিত বয়ানকারী (মাওলানা সাদ সাহেব) বিশেষ মানসিকতা নিয়ে কুরআন, হাদিস ও সাহাবায়ে কেরামের ঘটনাবলির ওপর চিন্তা-ভাবনা করে ভুল ফলাফল বের করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। যার ফলে অনেক সময় তার বাকভঙ্গিমা ও বচনশৈলীর কারণে নবুওয়াত ও রিসালাতের সিংহাসনের ওপরও আঁচ পড়ে যায়। তিনি ঘটনাবলি পেশ করার সময় নিজস্ব বোধ-বুদ্ধির কারণে এমনসব বিষয় বৃদ্ধি করে ফেলেন, যার পক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি এমন বিপদজনক বাকশৈলী ব্যবহার করে ফেলেন, যা কখনই আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের মর্যাদার সাথে খাপ খায় না। তিনি বিভিন্ন ঘটনাকে

এমনভাবে আলোচনা করেন যে, অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়– তিনি নবির ভুল ধরছেন। তিনি এমন বার্তা দিতে চান যে, এক্ষেত্রে নবি ভুল করেছেন। তাঁর অনুসরণ করা যাবে না। তোমরা কখনই এমন করবে না। তার একটি নমুনা দেখুন। তিনি বলেন-

> ‘আমি যা বলছি মনোযোগ সহকারে শুনবে। আল্লাহ তাআলা নবিদেরকে আসবাব (উপকরণ) এজন্যে দিতেন যে, তিনি পরীক্ষা করতেন যে, সে কি আমাকে মনে রেখেছে, না-কি উপকরণের কারণে আমার হুকুম নষ্ট করেছে। আমার কথাটি মনোযোগ সহকারে শুনবে। আল্লাহ তাআলা সুলাইমান আলাইহিস সালামকে অত্যন্ত বিরল ও দুষ্প্রাপ্য ঘোড়ার পাল দিয়েছিলেন। যা ইতোপূর্বে কাউকে দেননি, তার পরেও কাউকে দেননি। সেই অনিন্দ্য সুন্দর ঘোড়াগুলো আরোহীকে নিয়ে বাতাসে উড়তো। এতো শক্তিশালী ছিল যে, সমুদ্রে সাঁতার কাটতো। মাটির ওপর প্রবল বেগে ছুটতো। সুলাইমান আলাইহিস সালাম সেই সুন্দর ঘোড়াগুলো দেখার মাঝে মগ্ন হয়ে পড়লেন। এমনভাবে মগ্ন হয়ে গেলেন যে, আসর নামায কাযা হয়ে গেল। ঘোড়া দেখতে গিয়ে সূর্য ডুবে গেল। এগুলোকে তো আল্লাহ সৃষ্টি করেছিলেন। কেন সৃষ্টি করেছিলেন? এজন্যে সৃষ্টি করেছিলেন যে, যেন সৃষ্টিকর্তার প্রভাব জাগে। সৃষ্টির প্রভাব যেন না জাগে। কাফেররা সবসময় সৃষ্টির প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে যায়। আর মুসলমানরা সৃষ্টিকর্তার প্রভাব অনুভব করে। সৃষ্টি তো স্রষ্টার পরিচয় তুলে ধরে। তিনি সেগুলো দেখার মাঝে মগ্ন হয়ে পড়লেন। আসর নামায কাযা হয়ে গেল। তাকিয়ে দেখলেন যে, আরে, আসর নামায তো পড়া হয়নি। এতোগুলো সময় আসরের, কাযা হয়ে গেল! তরবারি আনতে বললেন। সবগুলো ঘোড়া হত্যা করলেন। একটাও বাকি রাখেননি। পুরো নির্বংশ করে দাও। কারণ, এই ঘোড়াগুলো দেখতে গিয়ে আসর নামায কাযা হয়ে গেছে। চিন্তা করে দেখো, যার নিজের আমল নষ্ট হওয়ার দুশ্চিন্তা থাকে, আল্লাহ তার আমল নষ্ট হতে দেন না। তিনি বললেন, তরবারি আনো। সবগুলো ঘোড়া হত্যা করলেন। ধ্বংস করলেন। আয় আল্লাহ, আমার আসর আদায় করতে হবে। আমার ঘোড়ার প্রয়োজন নেই।

> আমার আসর প্রয়োজন।’

লক্ষ্য করুন, তিনি হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের ঘটনাকে যেই পদ্ধতিতে পেশ করেছেন এবং ঘটনার ভূমিকা উল্লেখ করার পর মাঝখানে যেই ফলাফল বয়ান করলেন, তা কতটা বিপদজনক! নিজেই আসবাব বা সৃষ্টিজীব থেকে প্রভাবিত হওয়াকে কাফেরদের আমল বলছেন, আবার একজন মহান নবিকে আসবাব (দুনিয়াবি উপকরণ) দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করছেন। যার ফলে বিষয়টি কোথায় গড়িয়ে গেল! (নাউযুবিল্লাহ) অথচ আল্লাহ তাআলা কুরআন কারিমে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের ঘটনা উল্লেখ করেছেন প্রশংসাব্যঞ্জক শৈলীতে। কুরআন কারিমের আয়াত হলো,

> وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ○ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ ○ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ○ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ
>
> ‘আমি দাউদকে সুলায়মান দান করেছি। সে একজন উত্তম বান্দা। সে ছিল প্রত্যাবর্তনশীল। যখন তার সামনে অপরাহ্নে উৎকৃষ্ট অশ্বরাজি পেশ করা হলো,
>
> তখন সে বললো— আমি তো আমার পরওয়ারদেগারের স্মরণে বিস্মৃত হয়ে সম্পদের মহব্বতে মুগ্ধ হয়ে পড়েছি-এমনকি সূর্য ডুবে গেছে।
>
> এগুলোকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনো। অতপর সে তাদের পা ও গলদেশ ছেদন করতে শুরু করলো।’ (সূরা সোয়াদ : ৩০-৩৩)

বয়ানকারীর বয়ানের এই বাক্যগুলো লক্ষ্য করুন,

> “সুলাইমান আলাইহিস সালাম সেই সুন্দর ঘোড়াগুলো দেখার মাঝে মগ্ন হয়ে পড়লেন। এমনভাবে মগ্ন হয়ে গেলেন যে, আসর নামায কাযা হয়ে গেল। ঘোড়া দেখতে গিয়ে সূর্য ডুবে গেল। এগুলোকে তো আল্লাহ সৃষ্টি করেছিলেন। কেন সৃষ্টি করেছিলেন? এজন্যে সৃষ্টি করেছিলেন যে, যেন সৃষ্টিকর্তার প্রভাব জাগে। সৃষ্টির প্রভাব যেন না জাগে। কাফেররা সবসময় সৃষ্টির প্রভাবে প্রভাবিত

> হয়ে যায়। আর মুসলমানরা সৃষ্টিকর্তার প্রভাব অনুভব করে। সৃষ্টি তো স্রষ্টার পরিচয় তুলে ধরে। তিনি সেগুলো দেখার মাঝে মগ্ন হয়ে পড়লেন। আসর নামায কাযা হয়ে গেল।”

অর্থাৎ সুলাইমান আলাইহিস সালাম ‘আসবাব’ (পার্থিব উপকরণ) দ্বারা এ পরিমাণ প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন যে, নাউযুবিল্লাহ পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছিলেন। ঘোড়া দেখার সময় তিনি সৃষ্টিকর্তার কুদরতে মুগ্ধ হওয়ার পরিবর্তে সৃষ্টিজীব ঘোড়ার মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে পড়েন। যেখানে দায়িত্ব ছিল, আল্লাহকে স্মরণ করা; তা না করে ঘোড়া দেখায় লিপ্ত হয়ে পড়েন।

তার এ জাতীয় বয়ানের মাধ্যমে অনুমিত হয় যে, তিনি নবুওয়াতের পদ ও আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের ইসমত (নিষ্পাপত্ব) এর স্পর্শকাতর নাজুক মাসআলা সম্পর্কে অজ্ঞ। এ কারণে তিনি আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের ঘটনাবলির ক্ষেত্রে নিজেকে মুজতাহিদের আসনে বসিয়ে মন্তব্য করার ধৃষ্টতা দেখিয়ে থাকেন। দুঃসাহসিকতা ও অবলীলার সাথে এমনসব বাক্য উচ্চারণ করেন বা এমন প্রভাব দেখাতে দ্বিধা করেন না যে, নবির এমন কাজ করা উচিত ছিল।

তার অধিকাংশ বয়ানের মাঝে এই বাক্যগুলো প্রায়সময় উচ্চারিত হয় যে, ‘একটি ভুল ধারণা হলো এই যে,’ ‘এই যুগের লোকেরা ভুল বোঝাবুঝির শিকার যে,’ ‘এটি আন্তর্জাতিক ভুল উপলব্ধি যে,’ ‘এটি হলো সবার গণভুল যে,’ ‘এটি শতভাগ বাতিল মতবাদ যে,’। অর্থাৎ তিনি তার আলোচনার মাঝে লাগামহীন সমালোচনা করতে অভ্যস্থ। আর কোনো ব্যক্তি যখন স্বল্পজ্ঞানের ভিত্তিতে ভিত্তিহীন সমালোচনা করে তখন সে নিজের জ্ঞান ও উপলব্ধিকেই শ্রেষ্ঠ ভাবতে থাকে। ফলশ্রুতিতে সে যখন এই মন্তব্য করে যে, ‘আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দাওয়াত ও তালীম সুন্নত থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে।’ তাহলে সে নেপথ্যে এই দাবি করছে যে, দাওয়াত ও তালীমের সুন্নতি তরিকা এই যুগের সকল হকপন্থী আলিম থেকে সে বেশি বোঝে। যুগে যুগে মুসলিম উম্মাহর যতজন লোক চৈন্তিক বিকৃতি ও মতাদর্শিক বক্রতার শিকার হয়েছে, তাদের জীবনী গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে বুঝতে পারবেন যে, তাদের গুমরাহির অন্যতম কারণ ছিল– তারা ইজতিহাদের যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও মুজাতাহিদ ইমামগণ, মহান পূর্বসূরিবৃন্দ ও সমকালীন হকপন্থী আলিমদের ওপর আস্থা না রেখে নিজস্ব চিন্তাধারা ও আত্মম্ভরিতার পথ

অবলম্বন করে একান্ত নিজস্ব পথ বানিয়ে নিয়েছিল। এ কারণে দারুল উলুম দেওবন্দ ৩১ জানুয়ারি ২০১৮ ই. তারিখে প্রকাশিত প্রবন্ধে যে বিষয়টি সম্পর্কে সতর্ক করেছিল, তা শতভাগ বস্তুনিষ্ঠ। বলেছিল, এই বয়ানকারী ব্যক্তি জ্ঞানস্বল্পতা ও স্বাধীন মানসিকতার কারণে কুরআন, হাদিস ও সাহাবায়ে কেরামের সীরাতের ক্ষেত্রে নিজেকে মুজতাহিদের আসনে বসিয়ে চিন্তাভাবনা করে থাকেন। ফলশ্রুতিতে তিনি নিয়মিত অবাস্তব ইজতিহাদ করে যাচ্ছেন। যার কারণে তার মুখ থেকে নিয়মিত একের পর এক বিচ্ছিন্ন ও প্রত্যাখ্যাত বাণী, মতবাদ, চিন্তাধারা এবং গুমরাহি মতবাদ প্রকাশ পাচ্ছে। দ্বীনের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি বিচ্যুতির শিকার হলে, জনগণকে তার বিভ্রান্ত চিন্তাধারায় জড়িয়ে পড়া থেকে প্রজ্ঞা ও কর্মকৌশলের সাথে বাঁচানো উলামায়ে কেরামের অন্যতম অনিবার্য দায়িত্ব। হাফেয সুয়ূতি রহ. تحذير الخواص من أكاذيب القصاص গ্রন্থে এবং হাফেয ইবনুল জাওযি রহ. তাঁর বিখ্যাত রচনা كتاب القصاص والمذكرين এর মাঝে এমন বক্তাদের প্রচণ্ড ভর্ৎসনা করেছেন, যারা নিজ বয়ানের মাঝে বানোয়াট ও বিরল কথাবার্তা ছড়িয়ে জনগণকে নিজের দিকে আকর্ষিত করে থাকে এবং জনগণের মস্তিষ্কে ইসলামের ভুল চিত্র আঁকার চেষ্টা করে থাকে। হাফেয ইবনু কুতাইবা রহ. লিখেছেন, অজ্ঞতার কারণে সাধারণত জনগণ এমন বক্তাদের অধিক পসন্দ করে থাকে, যারা আলোচনার মাঝে স্বাভাবিকতার পথ থেকে সরে বিরল দুষ্প্রাপ্য ও অভিনব কথাবার্তা বলে। অথচ এমন বক্তাদের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ কঠোর ভর্ৎসনা করেছেন।

এখন আপনাদের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর পেশ করছি–

১. বয়ানকারীর আলোচিত বয়ানগুলো শরিয়তের আলোকে সঠিক নয়। এগুলোর সিংহভাগই হচ্ছে শরিয়তের ভাষ্য থেকে মনগড়া আবিষ্কার। কুরআন, হাদিস ও সাহাবায়ে কেরামের সীরাতের ভুল ও প্রত্যাখ্যাত বিশ্লেষণের ওপর সেই আবিষ্কার নির্মিত। ان جیسے بیانات کو آگے پھیلانا اور کسی بھی ذریعہ سے اس کی نشر واشاعت کرنا جائز نہیں. —এ জাতীয় বয়ান অন্যদের কাছে ছড়ানো এবং কোনো মাধ্যম ব্যবহার করে প্রচার-প্রসার করা নাজায়েয। বয়ানকারীর কর্তব্য হলো, তিনি এ জাতীয় বয়ান শতভাগ পরিহার করবেন। বয়ান করার সময় মহান পূর্বসূরিগণ ও আমাদের আকাবিরদের বিশ্লেষণ অনুসরণ করবেন। সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টির কারণ

হবেন না। এটাই নিরাপদ পথ। এর মাঝেই সকলের কল্যাণ নিহিত।

২. যেসকল ব্যক্তিবর্গ জ্ঞাতসারে এ জাতীয় বয়ানগুলোর অপব্যাখ্যা করছেন এবং বয়ানকারীর পক্ষ নিয়ে সহজ-সরল জনগণকে ভুল পথে পরিচালিত করছেন, তাদের এই কর্মপন্থা আফসোসজনক। তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

৩. দারুল উলুম দেওবন্দ একটি জামাত হিসেবে তাবলীগ জামাতের কখনই বিরোধী নয়। এটি আমাদের আকাবিরদের হাতে গড়া একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি জামাত। দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের একটি উপকারী মাধ্যম।

দারুল উলুম দেওবন্দ ইতোপূর্বেও বিস্তারিত অবস্থান (মাওকিফ) উলামায়ে কেরামের সামনে প্রকাশ করার মাধ্যমে নিজ দ্বীনি ও শারঈ দায়িত্ব পালন করেছে এবং অদ্যাবধি সেই অবস্থানের ওপর অবিচল প্রতিষ্ঠিত। এখন আরো বিস্তারিত ও দলিল সমৃদ্ধ অবস্থান উলামায়ে কেরামের সামনে পেশ করছে। জনগণের দায়িত্ব হলো, তারা স্থানীয় যেসকল নির্ভরযোগ্য আলিমদের কাছ থেকে বিভিন্ন শারঈ মাসাআলায় দিকনির্দেশনা করে থাকেন, এ ব্যাপারেও তাদের শরণাপন্ন হবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সীরাতে মুসতাকিমের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন এবং মুসলিম উম্মাহকে সর্বপ্রকার ফিতনা ও মন্দত্ব থেকে নিরাপদ রাখুন। আমিন।

আরবি উদ্ধৃতিসমূহ

১. হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদি. এর ঘটনা সম্পর্কিত তাখরিজসমূহ ও মুহাদ্দিস ও ফকিহগণের সুস্পষ্ট আলোচনা–

في حياة الصحابة (٥١٦/٢، ت بشار) قصة ردّ أبي بكر الصديق رضي الله عنه وظيفته من بيت المال، أخرج البيهقي عن الحسن أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنَّ أكيسَ الكَيْس التقوى – فذكر الحديث، وفيه: فلما أصبح غدا إِلى السوق فقال له عمر رضي الله عنه: أين تريد؟ قال: السوق، قال: قد جاءك ما يشغلك عن السوق، قال: سبحان الله، يشغلني عن عيالي قال: نفرض بالمعروف؛ قال: ويحَ عمر إِني أخاف أن لا يسعني

أن آكل من هذا المال شيئاً. قال: فأنفقَ في سنتين وبعض أخرى ثمانية آلاف درهم، فلما حضره الموت قال: قد كنت قلت لعمر: إني أخاف أن لا يسعَني أن آكل من هذا المال شيئاً، فغلبني؛ فإذا أنا متُّ فخذوا من مالي ثمانية آلاف درهم وردوها في بيت المال، قال: فلما أُتي بها عمر قال: رحم الله أبا بكر، لقد أتعب من بعده تعباً شديداً.

تخريج الروايات المتعلقة بهذه القصة :

أخرج البخاري في صحيحه (٢٠٧٠) قال : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، قَالَ: «لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَؤُنَةِ أَهْلِي، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ المُسْلِمِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا المَالِ، وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ. وأخرج أبي سعد في الطبقات الكبري : ١٩٢/٣، دار صادر، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٢٦١٩) عن وكيع، وأبو عوانة في مستخرجه (١٠٤٩٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٣٥٣/٦) من طريق ابن نمير، به وأخرج ابن سعد : (١٩٢/٣) من طرق مختلفة، قال ابن حجر في فتح الباري : (٣٠٤/٤) روي ابن سعد وابن المنذر بإسناد صحيح عن مسروق عن عائشة. وأخرجه أبو عبيد ي الأموال: (٦٦٠) وابن زنجوية في الأموال : (٩٨٤) من طريق أبي النضر (وهو هاشم بن القاسم)، عن سليمان بن المغيرة، به. رجاله ثقات. وأخرجه الإمام أحمد في الزهد (ص: ٩١) من طريق عبد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، به. قال البوضيري في إتحاف الخيرة : (١٤٨/٧) رواه مسدد بسند فيه سمية ولم أر من ذكرها بعدالة ولا جرح وباقي رواه الإسناد ثقات. سمية البصرية، تروى عن عائشة، روي عنها ثابت البناني فقط، من الطبقة الوسطى من التابعين، قال ابن حجر في التقريب : مقبولة. وأخرج الطبراني في المعجم الكبير : (٦٠/١) رجاله ثقات، وفيه انقطاع؛ فإن عبد الله بن حسن لم يسمع من جده

حسن بن علي رضي الله عنه، لأن عبد الله بن حسن ولد سنة ٧٠ ه وجده حسن بن علي رضي الله عنه توفي سنة ٤٩ هوقيل سنة ٥٠ هوأخرج ابن عساكر في تاريخه : (٢٧٥/٦١)

تخريج الرواية المذكورة في حياة الصحابة :

أخرج البيهقي في السنن الكبرى : (٣٥٣/٦) قال : أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (وهو الحاكم) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرِ بْنِ يَحْيَ حَدَّثَنِي أَبِي خبرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الْفَرَّاءُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ أَكْيَسَ الْكَيْسِ التَّقْوَى وَأَحْمَقَ الْحُمْقَ الْفُجُورُ أَلاَ وَإِنَّ الصِّدْقَ عِنْدِى الأَمَانَةُ وَالْكَذِبَ الْخِيَانَةُ أَلاَ وَإِنَّ الْقَوِىَّ عِنْدِى ضَعِيفٌ حَتَّى آخُذَ مِنْهُ الْحَقَّ وَالضَّعِيفَ عِنْدِى قَوِىٌّ حَتَّى آخُذَ لَهُ الْحَقَّ أَلاَ وَإِنِّى قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِأَخْيَرِكُمْ. قَالَ الْحَسَنُ : هُوَ وَاللَّهِ خَيْرُهُمْ غَيْرَ مُدَافَعٍ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ يَهْضِمُ نَفْسَهُ. ثُمَّ قَالَ : لَوَدِدْتُ أَنَّهُ كَفَانِى هَذَا الأَمْرَ أَحَدُكُمْ. قَالَ الْحَسَنُ : صَدَقَ وَاللَّهِ. وَإِنْ أَنْتُمْ أَرَدْتُمُونِى عَلَى مَا كَانَ اللَّهُ يُقِيمُ نَبِيَّهُ مِنَ الْوَحْىِ مَا ذَلِكَ عِنْدِى إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَرَاعُونِى فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَى السُّوقِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ السُّوقَ قَالَ : قَدْ جَاءَكَ مَا يَشْغَلُكَ عَنِ السُّوقِ. قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ يَشْغَلُنِى عَنْ عِيَالِى قَالَ : تَفْرِضُ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ : وَيْحَ عُمَرَ إِنِّى أَخَافُ أَنْ لاَ يَسَعَنِى أَنْ آكُلَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْئًا قَالَ فَأَنْفَقَ فِى سَنَتَيْنِ وَبَعْضِ أُخْرَى ثَمَانِيَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ قَدْ كُنْتُ قُلْتُ لِعُمَرَ إِنِّى أَخَافُ أَنْ لاَ يَسَعَنِى أَنْ آكُلَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْئًا فَغَلَبَنِى فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَخُذُوا مِنْ مَالِى ثَمَانِيَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَرُدُّوهَا فِى بَيْتِ الْمَالِ قَالَ فَلَمَّا أُتِىَ بِهَا عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَحِمَ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ لَقَدْ أَتْعَبَ مَنْ بَعْدَهُ تَعَبًا شَدِيدًا.

محمد بن طاهر بن يحي، روي عنه الحاكم في مستدركه وصحح حديثه وترجمه في تاريخه، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وأبوه طاهر بن يحي بن قبيصة، قال

السمعاني في الأنساب : (٣٨٧/٤) كان من كبار المحدثين لأصحاب الرأي. محمد بن أبي خالد القراء، لم نجد فيه مزيدا على ما قال السمعاني في الأنساب : (١٥٣/١٠)

أبو أحمد محمد بن أبي خالد يزيد بن صالح الفراء، هو ابن أبي صالح، نيسابوري، سمع أباه ويحي بن يحي، روي عنه طاهر بن يحي ومكي بن عبدان وغيرهما، مات في شعبان سنة ست . أبو خالد الفراء هو يزيد بن صالح اليشكري، صدوق، قاله الذهبي في سير أعلام النبلاء : (٤٧٩/٤) هذا من مراسيل الحسن، مع ما في الإسناد إليه غير واحد لم يوقف على حاله.

خلاصة ما في الروايات المتعلقة بقصة رد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وظيفته من بيت المال مقارنا برواية البيهقي :

ذكر في رواية البيهقي أمور، منها : قصة ذهابه إلى السوق بعد تولى الخلافة، ومنع عمر له، ثم فرض الوظيفة له من بيت المال، وهذه القصة جاءت في رواية الواقدي ومرسل عطاء بن السائب وحميد بن هلال، وهما من طبقة التابعين، واستدل ابن حجر بمرسل عطاء بن السائب في فتح الباري على أن المفروض لأبي بكر من بيت المال كان باتفاق من الصحابة. ومنها : وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه برد ما أنفق من بيت المال في عهد خلافته، ومقداره في رواية البيهقي (فيه غير واحد ممن لا يعرف مع إرسال الحسن) : ثمانية ألاف درهم، وهي مرسل ابن سيرين (رجاله ثقات) : سنة ألاف درهم. وقد جاء في روايات أخرى : أنه أوصى برد ما بقي عنده من بيت المال، وهو في رواية مسروق عن عائشة (رجاله ثقات) : عبد وبعير ناضح، وفي رواية القاسم عن عاشة (رجاله ثقات) : اللقحة والغلام، وفي رواية سمية عن عائشة (إسناده لا بأس به): اللقحة والقدح، وفي رواية البكائى عن عائشة (فيه ضعف وانقطاع) : خادم وبعير ناضح، وفي رواية أنس (رجاله ثقات) : خادم ولقحة ومحلب، وفي رواية الحسن بن علي

(فيه انقطاع) : لقحة وجفنة وقطيفة، وفي رواية أبي بكر بن حفص بن عمر (مرسل رجاله ثقات) : عبد وبغير ناضح وجرد قطيفة، وفي رواية محمد بن الأشعث (فيه من لا يعرف) : جارية ولقحتان وحالبهما، وفي رواية الواقدي : لقحة وعبد وقطيفة. وأما رواية عروة عن عائشة التي في صحيح البخاري فهي مختصرة، وليس فيها تعرض للوصية برد المال.(السنن الكبرى للبيهقي، رقم : ٢٠٢٨٨)

بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْقَاضِي مِنَ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَالنَّظَرِ فِي النَّفَقَةِ عَلَى أَهْلِهِ وَفِي ضَيْعَتِهِ لِئَلَّا يَشْغَلَ فَهْمَهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ , أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: " لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " قَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ لِتَعْجَزَ عَنْ مُؤْنَةِ أَهْلِي , وَقَدْ شُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ , فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ " وَاحْتَرَفَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ. وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَتْ: " لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَكَلَ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنَ الْمَالِ , وَاحْتَرَفَ فِي مَالِ نَفْسِهِ ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ , مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَمَا مَضَى فِي كِتَابِ الْقَسَمِ وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ أَبَا بكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ حِينَ اسْتُخْلِفَ , فَذَكَرَ الْحَدِيثَ , قَالَ: " فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَى السُّوقِ , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: " أَيْنَ تُرِيدُ؟ " , قَالَ: "السُّوقَ"، قَالَ: " وَقَدْ جَاءَكَ مَا يَشْغَلُكَ عَنِ السُّوقِ؟ " , قَالَ: " سُبْحَانَ اللهِ يَشْغَلُنِي عَنْ عِيَالِي؟ قَالَ: " تَفْرِضُ بِالْمَعْرُوفِ ". ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَذَكَرَ فِيهِ وَصِيَّتَهُ بِرَدِّ مَا أُخِذَ مِنْهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ".(بخاري، رقم : ٢٧٧٦)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ أَهْلِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ. (شرح صحيح البخاري لابن بطال : ٢٥٩/٥، مكتبة الرشد، رياض)

قال ابن بطال : قال الطبرى: وفيه من الفقه أن من كان مشتغلا من الأعمال بما فيه لله بر وللعبد عليه من الله أجر أنه يجوز أخذ الرزق على اشتغاله به إذا كان

فى قيامه سقوط مئونة عن جماعة من المسلمين أو عن كافتهم، والمؤذنين أخذ الأرزاق على تأذينهم، والمعلمين على تعليمهم. وذلك أن النبى (صلى الله عليه وسلم) جعل لولى الأمر بعده فيما كان أفاء الله عليه مؤنته، وإنما جعل ذلك لاشتغاله، فبان أن كل قيم بأمر من أمور المسلمين مما يعمهم نفعه سبيله سبيل عامل النبى. (مرقاة المفاتيح، رقم : ٥٩٧٥، ٥٩٧٣)

قال الملا علي القاري : «مَئُونَةِ عَامِلِي» أَرَادَ بِالْعَامِلِ: الْخَلِيفَةَ بَعْدَهُ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ مِنَ الصَّفَايَا الَّتِي كَانَتْ لَهُ مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ، وَفَدَكَ، وَيَصْرِفُ الْبَاقِي فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ وَلِيَهَا أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ كَذَلِكَ. وقال بعض المحققين : اختلف في المراد بقوله : (مؤنة عاملي) فقيل : الخليفة بعده، وهذا هو المعتمد.

وقال نقلا عن العلامة الكرماني في شرح البخارى : هي نصف أرض فدك، وثلث أرض وادي القري، وسهمه عن خمس خيبر، وحصة من أرض بني النضير.

وانظر أيضا : لامع الدراري : ١٩٩/٧، مكتبة امدادية، مكتبة المكرمة. شرح الطريقة المحمدية للنابلسي : ٤٩٠/٢

وأما مصارف بيت المال فهم المقاتلة من العساكر وأمراؤه والولاة والقضاة والمحتسبون والمفتيون والمعلمون والمتعلمون وقرأ القرآن والمؤذنون وكل من قلد شيئا من مصالح أمور المسلمين وقال شيخ الإسلام خواهرزاده في شرح القدوري : وأهل العطاء في زماننا القاضي والمدرس والمفتي.

قال النابلسي : ذكر قاضي خان في فتاواه من باب الحظر والإباحة أنه سئل على الرازي عن بيت المال هل للأغنياء فيه نصيب، قال : لا إلا أن يكون عاملا أو قاضيا أو فقيها فرغ نفسه لتعليم النسا الفقه أو القرآن، وقال العلامة زين الدين ابن نجيم : وليس مراد الرازي الاقتصار على العامل والقاضي؛ بل أشار بهما إلى كل

من فرغ نفسه للمسلمين، فيدخل الجندي والمفتي. (بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية : ٤/٢٤٠، ٢٥٠، مطبعة الحلبي ١٣٤٨ هـ)

(الْفَصْلُ الثَّانِي فِي التَّوَرُّعِ) التَّكَلُّفِ فِي تَحْصِيلِ الْوَرَعِ (وَالتَّوَقِّي) التَّحَفُّظِ (مِنْ طَعَامِ أَهْلِ الْوَظَائِفِ مِنْ الْأَوْقَافِ أَوْ) مِنْ (بَيْتِ الْمَالِ مَعَ اخْتِلَاطِ) هَذَا الْمُتَوَرِّعِ مَعَ (الْجَهَلَةِ وَالْعَوَامِّ وَأَكْلِ طَعَامِهِمْ) مَعَ أَنَّ الْأَوْلَى لَهُ أَنْ يَجْتَنِبَ عَنْ هَؤُلَاءِ (وَهَذَا التَّوَرُّعُ (نَاشِئٌ مِنْ الْجَهْلِ) بِحَقِيقَةِ الْحَالِ (أَوْ) مِنْ (الرِّيَاءِ) فَيَتَجَنَّبُ لِيَرَى النَّاسُ أَنَّهُ وَرِعٌ (فَكَمَا أَنَّ الْكَسْبَ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ وَنَحْوِهَا) كَالزَّرْعِ وَأَنْوَاعِ الْحِرَفِ (إذَا رُوعِيَ فِيهَا شَرَائِطُ الشَّرْعِ حَلَالٌ) بَلْ (طَيِّبٌ كَذَلِكَ الْوَقْفُ إذَا صَحَّ وَرُوعِيَ) فِيهِ (شَرَائِطُ الْوَقْفِ) وَلِلْمَانِعِ أَنْ يَقُولَ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَوَرُّعُ الْمُتَوَرِّعِ لِلِاشْتِبَاهِ فِي صِحَّةِ أَصْلِ الْوَقْفِ، وَفِي تَحَقُّقِ شَرَائِطِهِ وَوُقُوعِهِ فِي مَصْرِفِهِ وَقَدْرِهِ سِيَّمَا فِي زَمَانِنَا (فَلَا شُبْهَةَ فِيهِ) أَيْ فِي حَالِهِ (أَصْلًا) وَلِلْمَانِعِ أَيْضًا أَنْ يَقُولَ: إنَّ شَرْطَ الْوَاقِفِ لَوْ كَانَ لِنَفْسِ ذَلِكَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فَكَيْفَ يَسُوغُ أَنْ يُبِيحَ أَوْ يَهَبَ إلَى غَيْرِهِ بَلْ أَوْقَافُ بَيْتِ الْمَالِ مُخْتَصَّةٌ بِقَدْرِ الْكِفَايَةِ؛ وَلِذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ عَلَى الْكِفَايَةِ فِي شُبْهَةٍ (إذْ الصَّحَابَةُ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - وَقَفُوا)

قِيلَ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَوَّلُ مَنْ وَقَفَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَكَانَ فِي عَهْدِهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِسَهْمِهِ مِنْ خَيْبَرَ (وَأَكَلُوا مِنْهُ) وَلَمْ يُنْقَلْ الْإِنْكَارُ مِنْهُمْ فَيَحِلُّ مَحَلَّ الْإِجْمَاعِ (وَكَذَا بَيْتُ الْمَالِ يَحِلُّ لِمَنْ كَانَ مَصْرِفًا لَهُ إذَا أَخَذَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْكِفَايَةِ) لِنَفْسِهِ وَخَادِمِهِ وَأَهْلِهِ وَأَوْلَادِهِ وَالْكُتُبِ اللَّازِمَةِ لَهُ إنْ كَانَ عَالِمًا، وَفِي الْمِنَحِ: لِكُلِّ قَارِئٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِائَتَا دِينَارٍ أَوْ أَلْفَا دِرْهَمٍ إنْ أَخَذَهَا فِي الدُّنْيَا، وَإِلَّا أَخَذَهَا فِي الْآخِرَةِ كَذَا قِيلَ فِي مَآلِ الْفَتَاوَى أَيْضًا (وَقَدْ أَخَذَ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - سِوَى عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مِنْهُ) أَيْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَعَدَمُ أَخْذِ عُثْمَانَ لِغِنَاهُ وَعَدَمِ احْتِيَاجِهِ؛ إذْ رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ لِعُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عِنْدَ خَادِمِهِ يَوْمَ قَتْلِهِ مِائَةُ أَلْفِ أَلْفٍ وَخَمْسُونَ أَلْفِ أَلْفِ دِينَارٍ

وَأَلْفُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَخَلَّفَ إِجْبَاءً قِيمَتُهَا مِائَتَا أَلْفِ دِينَارٍ وَبَلَغَ ثَمَنُ مَالِ الزُّبَيْرِ خَمْسِينَ أَلْفِ دِينَارٍ وَتَرَكَ أَلْفَ فَرَسٍ وَأَلْفَ مَمْلُوكٍ وَخَلَّفَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ثَلَاثَمِائَةِ أَلْفِ دِينَارٍ، وَغِنَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُذْكَرَ فَكَانَتْ الدُّنْيَا فِي أَكُفِّهِمْ لَا فِي قُلُوبِهِمْ

كَمَا نُقِلَ عَنْ التَّنْوِيرِ لَكِنَّهُمْ مَعَ مِثْلِ هَذِهِ الْأَمْوَالِ الْعِظَامِ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لِعَدَمِ حُبِّهِمْ إِيَّاهَا وَعَدَمِ شَغْلِ قُلُوبِهِمْ فِي وُجُوهِهَا بَلْ مُعْظَمُ قَصْدِهِمْ بَذْلُ تِلْكَ الْأَمْوَالِ إِلَى الْمَحَاوِيجِ وَوُجُوهِ الْبِرِّ وَطُرُقِ الْحَسَنَاتِ كَمَا رُوِيَ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِي غُزَاةِ تَبُوكَ أَحَدٌ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ مَالُ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - وَقَدْ رُوِيَ مِنْ ثَلَاثِينَ أَلْفًا إِلَى ثَمَانِينَ أَلْفًا (فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَقْفِ وَبَيْتِ الْمَالِ وَبَيْنَ غَيْرِهِمَا مِنْ الْمَكَاسِبِ فِي) أَصْلِ (الْحِلِّ وَالطِّيبِ إِذَا رُوعِيَ شَرَائِطُ الشَّرْعِ وَلَا فِي الْحُرْمَةِ وَالْخُبْثِ إِذَا لَمْ تُرَاعَ) شَرَائِطُهُ (بَلْ الْأَوَّلَانِ) الْوَقْفُ وَبَيْتُ الْمَالِ (أَشْبَهُ وَأَمْثَلُ فِي زَمَانِنَا).

(عمدة القاري للعيني : ١٨٦/١١، دار احياء التراث العربي، بيروت)

وكل من يتَوَلَّى عملا من أَعمال الْمُسلمين يُعْطي لَهُ شَيْء من بَيت الْمَال لِأَنَّهُ يحْتَاج إِلَى كِفَايَته وكفاية عِيَاله، لِأَنَّهُ إِن لم يُعْط لَهُ شَيْء لَا يرضى أَن يعْمل شَيْئا فتضيع أَحْوَال الْمُسلمين. وَعَن ذَلِك قَالَ أَصْحَابنَا: وَلَا بَأْس برزق الْقَاضِي، وَكَانَ شُرَيْح، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، يَأْخُذ على الْقَضَاء.(كتاب الخراج لأبي يوسف ؒ : ٢٠٥/١، المكتبة الأزهرية للتراث)

فصل في أرزاق القضاة والعمال وسألت من أي وجه تجري على القضاة والعمال الأرزاق؟ فاجعل- أعز الله أمير المؤمنين بطاعته- ما يجري على القضاة والولاة من بيت مال المسلمين : من جباية الأرض أو من خراج الأرض والجزية؛ لأنهم في عمل المسلمين فيجرى عليهم من بيت مالهم ويجري على كل والي مدينة وقاضيها بقدر ما يحتمل. وكل رجل تصيره في عمل المسلمين فأجر عليه من بيت مالهم، ولا تجر على الولاة والقضاة من مال الصدقة شيئا إلا والي الصدقة؛ فإنه يجري عليها

منها كما قال الله تبارك وتعالى (والعاملين عليها) ولم تزل الخلفاء تجري للقضاة الأرزاق من بيت مال المسلمين. (نصب الراية : ١٣٧/٤، مؤسسة الريان للطباعة والنشر، بيروت)

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ يَرْزُقُ الْمُعَلِّمِينَ، ثُمَّ أَسْنَدَ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: أَنْ أَعْطِ النَّاسَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ. (تبيين الحقائق : ٣٣/٦، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، القاهرة)

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (وَرِزْقُ الْقَاضِي) أَيْ حَلَّ رِزْقُ الْقَاضِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ بَيْتَ الْمَالِ أُعِدَّ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَالْقَاضِي مَحْبُوسٌ لِمَصَالِحِهِمْ وَالْحَبْسُ مِنْ أَسْبَابِ النَّفَقَةِ فَكَانَ رِزْقُهُ فِيهِ كَرِزْقِ الْمُقَاتِلَةِ وَالزَّوْجَةِ يُعْطَى مِنْهُ مَا يَكْفِيهِ، وَأَهْلَهُ عَلَى هَذَا كَانَتْ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ «وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ إلَى مَكَّةَ، وَفَرَضَ لَهُ وَبَعَثَ عَلِيًّا، وَمُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ، وَفَرَضَ لَهُمَا»، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَالْخُلَفَاءُ مِنْ بَعْدِهِ يَأْخُذُونَ كِفَايَتَهُمْ فَكَانَ إجْمَاعًا. (بناية : ٢٧٢/١٢، دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان)

وفي " مصنف " عبد الرزاق: أخبرنا الحسن بن عمارة، عن الحكم: أن عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - رزق شريحا، وسلمان بن ربيعة الباهلي على القضاء، وروى ابن سعد في " الطبقات " في ترجمة شريح: أخبرنا الفضل بن دكين، حدثنا الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى قال: بلغني أن عليا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - رزق شريحا خمسمائة. وروى في ترجمة زيد بن ثابت - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، أخبرنا عفان بن مسلم، حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن الحجاج بن أرطاة، عن نافع قال: استعمل عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا.

وقال أيضا: أخبرنا محمد بن عمر الواقدي، أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قال: بويع أبو بكر الصديق - رَضِيَ

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - يوم قبض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة، وكان رجلا تاجرا يغدو كل يوم إلى السوق فيبيع ويبتاع فلما بويع للخلافة قال: والله ما يصلح للناس إلا التفرغ لهم والنظر في شأنهم ولا بد لعيالي ما يصلحهم فترك التجارة وفرض من مال المسلمين ما يصلحه ويصلح عياله يوما بيوم، وكان الذي فرضه له في كل سنة ستة آلاف درهم، فلما حضرته الوفاة قال لهم: ردوا ما عندنا إلى مال المسلمين، وإن أرضي التي هي بمكان كذا وكذا للمسلمين بما أصبت من أموالهم، فدفع ذلك إلى عمر - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فقال: لقد والله أتعبت من بعدك. (الخانية على هامش الهندية : ٢/٣٢٥، كتاب الاجارة)

قال الشيخ الإمام ابو بكر محمد بن فضل رحمه الله تعالى : إنما كره المتقدمون الاستنجار لتعليم القرآن وكرهو أخذ الأجر على ذلك، لإنه كان للمعلمين عطيات في بيت المال في ذلك الزمان ، وكان لهم زياده رغبة في أمر الدين واقامة الحسبة، وفي زماننا انقطعت عكياتهم، وانقضت رغائب الناس في أمر الأخرة، فلو اشتغلوا بالتعليم مع الحاجة إلى مصالح المعاش لاختل معاشهم، فقلنا بصحة الاجارة ووجوب الاجرة للمعلم بحيث لو امتنع الوالد عن اعطاء الاجر حبس فيه. (أحكام القرآن للجصاص : ٢/٣٦٣، دار إحياء التراث العربي- بيروت)

إن الرزق ليس بأجرة لشيء وإنما هو شيء جعله الله له ولكل من قال بشيء من أمور المسلمين ألا ترى أن الفقهاء لهم أخذ الأرزاق. (بخارى، رقم : ٧١٦٣، باب رزق الحكام والعاملين عليها)

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ، أَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ العُزَّى، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّعْدِيِّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فِي خِلاَفَتِهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَلِيَ مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالًا، فَإِذَا أُعْطِيتَ العُمَالَةَ كَرِهْتَهَا، فَقُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ عُمَرُ: فَمَا تُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ، قُلْتُ: إِنَّ

لِي أَفْرَاسًا وَأَعْبُدًا وَأَنَا بِخَيْرٍ، وَأُرِيدُ أَنْ تَكُونَ عُمَالَتِي صَدَقَةً عَلَى المُسْلِمِينَ، قَالَ عُمَرُ: لاَ تَفْعَلْ، فَإِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الَّذِي أَرَدْتَ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي العَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا، فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذْهُ، فَتَمَوَّلْهُ، وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَإِلَّا فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ».

(فتح الباري : ١٥٤/١٣، دار المعرفة، بيروت)

قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي حَدِيثِ عُمَرَ الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ عَلَى أَنَّ لِمَنْ شُغِلَ بِشَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِ الْمُسْلِمِينَ أَخْذَ الرِّزْقِ عَلَى عَمَلِهِ ذَلِكَ كَالْوُلَاةِ وَالْقُضَاةِ وَجُبَاةِ الْفَيْءِ وَعُمَّالِ الصَّدَقَةِ وَشَبَهِهِمْ لِإِعْطَاءِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ العمالة على عمله. (تاريخ دمشق : ٣٥/٢٤، دار الفكر، بيروت)

قَالَ: ثَلَاثَةٌ مُعَلِّمُونَ كَانُوا بِالْمَدِينَةِ يُعَلِّمُونَ الصِّبْيَانَ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَرْزُقُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا كُلَّ شَهْرٍ. (كتاب الأموال : ٣٣٣/١، دار الفكر، بيروت)

حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ : أَنْ أَعْطِ النَّاسَ عَلَى تَعَلُّمِ الْقُرْآنِ. (التراتيب الادارية للكتاني : ٢٢٧/١، دار الفكر، بيروت)

قال الكتاني : هل كان للولاة والقضاة راتب

في الهداية روي عنه عليه السلام أنه بعث عتّاب بن أسيد إلى مكة وفرض له. قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية: غريب. ثم ذكر عن ابن سعد في الطبقات أن عتّاب قال:

ما أصبت منذ وليت عملي هذا إلا ثوبين كسوتهما مولاي كيسان اهثم قال: وذكر أصحابنا أنه عليه السلام فرض له كل سنة أربعين أوقية، والأوقية أربعون

درهما، وذكر أبو الربيع بن سالم أنه عليه السلام فرض له كل يوم درهما، وفي طبقات ابن سعد أن عمر رزق عياض بن غنم حين ولاه جند حمص كل يوم دينارا وشاة ومدّا.

وفي البخاري في باب رزق الحكام والعاملين عليها: وكان شريح يأخذ على القضاء أجرا، وقالت عائشة: يأكل الوصي بقدر عمالته وأكل أبو بكر وعمر اه. وفي مصنف عبد الرزاق؛ الحسن بن عمارة عن الحكم أن عمر بن الخطاب رزق شريحا، وسليمان بن ربيعة الباهلي على القضاء اه. وروى ابن سعد في الطبقات بلغني أن عليا رزق شريحا خمسمائة، وأن عمر بن الخطاب استعمل زيد بن ثابت على القضاء، وفرض له رزقا ولما تخلف أبو بكر أصبح غاديا إلى السوق، فلقيه وأبو عبيدة فقالا: انطلق حتى نفرض لك شيئا. وأن أبا بكر لما استخلف جعلوا له ألفين فقال: زيدونا فزادوه خمسمائة.

أقول: كان الحافظ الزيلعي، والحافظ ابن حجر، لم يستحضرا في هذا الموطن حديث أبي داود والحاكم عن بريدة رفعه: أيما عامل استعملناه وفرضنا له رزقا فما أصاب بعد رزقه فهو غلول «١» . عزاه لهما الحافظ في تلخيص الحبير. وقد وجدت أبا داود بوّب عليه في أبواب الخراج والإمارة: باب في أرزاق العمال، ثم أخرجه بلفظ: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. ثم أخرج عن المسور بن شداد رفعه:

من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما، فإن لم يكن مسكن فليكتسب مسكنا، قال: قال أبو بكر: أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ غير ذلك فهو غالّ أو سارق «٢» .

وفي عون الودود على الحديث الأول: سكت عنه أبو داود: والمنذري. ورجاله ثقات، وفيه بينة على جواز أخذ العامل حقه من تحت يده، فيقبض من نفسه لنفسه، ثم

نقل عن الطيبي على الحديث الثاني: فيه أنه يحل له أن يأخذ مما في تصرفه من بيت المال قدر مهر زوجته ونفقتها وكسوتها، وكذا ما لا بد له منه من غير إسراف وتنعم اهـ.

ثم أخرج أبو داود عن ابن الساعدي قال: استعملني عمر على الصدقة، فلما فرغت أمر لي بعمالة (ما يأخذه العامل من الأجرة) فقلت: إنما عملت لله. فقال: خذ ما أعطيت؛ فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمّلني أي أعطاني عمالتي «٣» . قال الكنكوهي في التعليق المحمود على سنن أبي داود: عليه فيه جواز أخذ العوض من بيت المال على العمل العام، كالتدريس والقضاء وغيرهما، بل يجب على الإمام كفاية هؤلاء ومن في معناهم من بيت المال. وظاهر هذا الحديث وغيره مما يبين وجوب قبول ما أعطيه الإنسان من غير سؤال، ولا إشراف نفس، وبه قال أحمد وغيره، وحمل الجمهور على الاستحباب والإباحة اهانظر الباب ٤٩ من سراج الملوك والموفي خمسين. (التراتيب الادارية للكتاني : ٢/١١١، دار ارقم، بيروت)

الفصل الأول في أن لكلّ من شغل بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على شغله ذلك

روى البخاري (٩: ٨٤- ٨٥) «١» رحمه الله تعالى عن عبد الله بن السعدي أنه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر: ألم أحدّث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا، فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت: بلى. فقال عمر: فما تريد إلى ذلك؟ فقلت: إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين، قال عمر: لا تفعل فإني كنت أردت الذي أردت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه منّي، حتى أعطاني مرّة ثانية فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموّله وتصدق به. فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وإلا فلا تتبعه نفسك. انتهى.

قال ابن بطال، قال الطبري: في هذا الحديث الدليل الواضح على أن لمن شغل بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله ذلك، وذلك كالولاة والقضاة وجباة الفيء وعمال الصدقة وشبههم، لإعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر العمالة على عمله الذي استعمله عليه. فكذلك سبيل كلّ مشغول بشيء من أعمالهم له من الرزق على قدر استحقاقه عليه سبيل عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك. انتهى.

الفصل الرابع في أرزاق الخلفاء بعده صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم

١- أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه:

اختلف في ذلك: فذكر أبو الفرج ابن الجوزي في «صفوة الصفوة» (١: ٩٧) عن عطاء بن السائب قال: لما استخلف أبو بكر أصبح غاديا إلى السوق، وعلى رقبته أثواب يتّجر بها، فلقيه عمر وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهم فقالا: أنّي تريد يا خليفة رسول الله؟ قال: السوق، قالا: أتصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ قالا: انطلق حتى نفرض لك شيئا، فانطلق معهما، ففرضا له كلّ يوم شطر شاة وماكسوه في الرأس والبطن.

وذكر عن حميد بن هلال قال: لما ولي أبو بكر قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: افرضوا لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغنيه، قالوا: نعم، بردان إذا أخلقهما وضعهما وأخذ مثلهما، وظهره إذا سافر، ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل أن يستخلف، قال أبو بكر: رضيت.

وذكر ابن هشام في «البهجة» وابن الأثير في «تاريخه» (٢: ٤٢٤) : أن الذي فرض له رضي الله تعالى عنه ستة آلاف درهم في السنة، قال ابن هشام: ولما حضرته الوفاة قال: ردّوا ما عندنا من مال المسلمين، فدفع إلى عمر بن الخطاب لقوح وعبد وقطيفة ما تساوي خمسة دراهم، فقال عمر رضي الله تعالى عنهما: لقد أتعبت من

بعدك، وقال ابن الأثير: (٢: ٢٤٢) ولما حضرته الوفاة أوصى أن تباع أرض له ويصرف ثمنها عوض ما أخذه من مال المسلمين.

٢- عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه:

ذكر ابن الأثير في «تاريخه» أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال للمسلمين:

إني كنت امرآ تاجرا يغني الله عيالي بتجارتي، وقد شغلتموني بأمركم هذا، فما ترون أنه يحلّ لي في هذا المال؟ وعلي رضي الله تعالى عنه ساكت، فأكثر القوم، فقال: ما تقول يا علي؟ قال: ما أصلحك وأصلح عيالك بالمعروف ليس لك غيره، فقال القوم: القول ما قاله علي، فأخذ قوته.

٣- معاوية بن أبي سفيان:

ذكر أبو عمر ابن عبد البر في «الإستيعاب» (١٤١٦) عن سليمان بن موسى عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رزق معاوية على عمله بالشام عشرة آلاف دينار في كلّ سنة.

وذكر أيضا في الكتاب المذكور، عن صالح بن الوجيه قال: في سنة تسع عشرة كتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى يزيد بن أبي سفيان يأمره بغزو قيسارية، فغزاها وبها بطارقة الروم فحاصرهم أياما، وكان بها معاوية أخوه فتخلّفه عليها، وسار يزيد يريد دمشق، فأقام معاوية على قيسارية حتى فتحها في شوال سنة تسع عشرة، وتوفي يزيد في ذي الحجة من ذلك العام في دمشق، واستخلف أخاه معاوية على ما كان يزيد يلي من عمل الشام، ورزقه ألف دينار في كل شهر، كذا قال صالح بن الوجيه. انتهى.

«ذكر أبو عمر بن عبد البر في باب «العبادلة» من الإستيعاب: ص ٣٤٧ عبد الله

بن أم مكتوم الأعمى، القرشي العامري، فقال نقلا عن الواقدي: قدم المدينة مع مصعب بن عمير بعد بدر بيسير فنزل دار القرّاء اه» .

في ترجمة ابن أم مكتوم من طبقات ابن سعد: قدم المدينة مهاجرا بعد بدر بيسير، فنزل دار القراء. وهي دار مخرمة بن نوفل اهانظر ص ١٥٠ ج ٤.

باب من كان يعلم القرآن في المدينة ومن كان يبعثه عليه السلام إلى الجهات لذلك وحفاظ القرآن من الصحابة ومعلم الناس الكتابة من الرجال والنساء مؤمنين وكافرين والمفتين على عهده عليه السلام ومعبري الرؤيا واتخاذ الدار في ذلك الزمن ينزلها القراء كالمدارس اليوم وغير ذلك. (التراتيب الادارية : ١١٢/١، دار ارقم، بيروت) في الإستبصار لإبن قدامة المقدسي: لما قدم مصعب بن عمير المدينة نزل على أسعد بن زرارة فكان يطوف به على دور الأنصار، يقرئهم القرآن ويدعوهم إلى الله عزّ وجلّ، فأسلم على يديهما جماعة؛ منهم: سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، وغيرهما. اه(التراتيب الادارية : ١٠٤/١، دار ارقم، بيروت) وقال الحافظ السخاوي : من السلف الصالح من كان يتجر يقصد القيام بمؤونة من قصر نفسه على بث العلم والحديث، ولم يتفرغ من أجل ذلك للتكسب لعياله؛ فعن ابن المبارك أنه كان يقول للفضيل بن عياض: لولا أنت وأصحابك وعنى بهم السفيانين وابن علية وابن السماك ما اتجرت اه. (التراتيب الادارية : ٣١٤/١، دار ارقم، بيروت)

آدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح، ص : ١٦٢

وَلَيْسَ لَهُ التَّمَذْهُبُ بِمَذْهَبِ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْأَوَّلِينَ، وَإِنْ كَانُوا أَعْلَمَ وَأَعْلَى دَرَجَةٍ مِمَّنْ بَعْدَهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتَفَرَّغُوا لِتَدْوِينِ الْعِلْمِ وَضَبْطِ أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ مَذْهَبٌ مُهَذَّبٌ مُحَرَّرٌ مُقَرَّرٌ، وَإِنَّمَا قَامَ بِذَلِكَ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ النَّاحِلِينَ لِمَذَاهِبِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، الْقَائِمِينَ بِتَمْهِيدِ أَحْكَامِ الْوَقَائِعِ قَبْلَ وُقُوعِهَا، النَّاهِضِينَ بِإِيضَاحِ أُصُولِهَا وَفُرُوعِهَا، كَمَالِكٍ

وَأَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِمَا. (البرهان في أصول الفقه للجويني : ٢/١٧٧، دار الكتب العلمية بيروت)

أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذاهب أعيان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سبروا ونظروا وبوبوا الأبواب وذكروا أوضاع المسائل وتعرضوا للكلام على مذاهب الأولين.

والسبب فيه أن الذين درجوا وإن كانوا قدوة في الدين وأسوة للمسلمين فإنهم لم يفتنوا بتهذيب مسالك الاجتهاد وإيضاح طرق النظر والجدال وضبط المقال ومن خلفهم من أئمة الفقه كفوا من بعدهم النظر في مذاهب الصحابة فكان العامي مأمورا باتباع مذاهب السابرين. (نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي : ٩/٣٩٦٦)

قال إمام الحرمين في (البرهان): (أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذهب أعيان الصحابة -رضي الله عنهم -بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة، الذين سروا، ونظروا، وبوبوا الأبواب، وذكروا أوضاع المسائل، وتعرضوا الكلام على مذاهب الأولين؛ والسبب فيه أن الذين درجوا وإن كانوا قدوة للمسلمين، فإنهم لم يعتنوا بتهذيب مسائل الاجتهاد، وإيضاح طرق النظر، والذين بعدهم من أئمة المسلمين كفوا من بعدهم النظر في مذاهب الصحابة -رضي الله عنهم -فكان العامي مأمورًا باتباع مذهب السائرين والسابقين، وإن كان له حق الوضع، والتأسيس، والتأصيل، فللمتأخر حق التكميل، وكل موضع على الافتتاح، فقد يتطرق إلى مبادئه بعض النسخ، ثم يندرج المتأخر إلى التهذيب، والتكميل، فيكون المتأخر أحق أن يتبع؛ لجمعه المذاهب، وبيانها.

وهذا واضح في الحرف، والصناعات، فضلاً عن العلوم، ومسالك الظنون).

قلت: رأيت للشيخ تقي الدين بن الصلاح ما معناه: أن التقليد يتعين لهذه الأئمة الأربعة دون غيرهم من الصحابة -رضي الله عنهم -وغيرهم.

وعلل ذلك بغير طريقة الإمام، وقال: إن مذاهب هؤلاء انتشرت، وانبسطت، حتى

ظهر فيها تقييد مطلقها، وتخصيص عامها، وشروط فروعها. (كتاب القصاص والمذكرين لابن الجوزي، ص : ١٧٩، ٢٩٥، المكتب الإسلامي، بيروت)

قال ابن الجوزي : لَمَّا كَانَ الْخِطَابُ بِالْوَعْظِ فِي الْأَغْلَبِ لِلْعَوَامِّ وَجَدَ جُهَّالٌ مِنَ الْقُصَّاصِ طَرِيقًا إِلَى بُلُوغِ أَغْرَاضِهِمْ. ثُمَّ مَا زَالَتْ بِدَعُهُمْ تَزِيدُ حَتَّى تَفَاقَمَ الْأَمْرُ. فَأَتَوْا بِالْمُنْكَرَاتِ فِي الْأَفْعَالِ، وَالْأَقْوَالِ، وَالْمَقَاصِدِ.

بنبغي للواعظ أن يكون حافظا لحديث رسول الله عارفا لصحيحه وسقيمه ومسنده ومقطوعه ومعضله عالما بالتواريخ وسير السلف، حافظا لأخبار الزهاد، فقيها في دين الله، عالم بالعربية واللغة، فصيح اللسان، ومدار ذلك كله على تقوى الله عز وجل. لا ينبغي أن يقص على الناس إلا العالم المتقن فنون العلم؛ لأنه يسأل عن كل فن، فإن الفقيه إذا تصدر لم يكد يسأل عن الحديث والمحدث لا يكاد يسأل عن الفقه والواعظ يسأل عن كل علم، فينبغي أن يكون كاملا.

قال ابن قتيبة : القصاص يميلون وجوه العوام إليهم ويستدرون ما عندهم بالمناكير والغريب والأكاذيب من الأحاديث ومن شأن العوام القعود عن القاص ما كان حديثه عجيبا خارجا عن فطر العقول. (كتاب القصاص والمذكرين، ص : ١٢، المكتب الاسلامي، بيروت) فقط.

স্বাক্ষর করেছেন,

১. মুফতী হাবীবুর রহমান খায়রাবাদী, মুফতী, দারুল উলুম দেওবন্দ
২. মুফতী যাইনুল ইসলাম ইলাহাবাদী কাসেমী, মুঈনে মুফতী
৩. মুফতী মুসআব, মুঈনে মুফতী
৪. মুফতী মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ, মুঈনে মুফতী
৫. মুফতী ওয়াকার আলী, মুঈনে মুফতী

[দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারতের ফতোয়া বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত ফতোয়ার অনুবাদ শেষ হলো, বিহামদিল্লাহ।]